বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগৎ

(সংক্ষিপ্তসার)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্তির জন্য প্রস্তুত গবেষণা-নিবন্ধ(কলাবিভাগ)

পিএইচ. ডি. রেজিঃ নং - A00PH1201318

গবেষিকা

তিথি নস্কর

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪

নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই জগৎ। জীব তার পূর্বার্জিত প্রারব্ধ-কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎ-এ জন্মগ্রহণ করে এবং এখান থেকেই জীব তার বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহ করে। তাই সাহিত্যিক, দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক হতে শুরু করে আপামর সাধারণ মানুষের জগৎ-কে জানবার দুর্নিবার ইচ্ছা সেই সুপ্রাচীন কাল হতে পরিলক্ষিত। আমরা যদি ইতিহাসের দিকে ফিরে তাকাই তা হলে দেখতে পাব একটা সময় ছিল যখন মানুষ অরণ্যে বিচরণ করতো, বনের ফল, মূল ও পাতা সংগ্রহ করে জীবন অতিবাহিত করতো। সে সময় মোহময়ী পৃথিবীর বৈচিত্র্য তাদের নিকট রহস্যাবৃত মনে হত। ফলস্বরূপ তারা এই বৈচিত্র্যে মোড়া জগতের পরতে পরতে মিশে থাকা রহস্যজাল ভেদ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে, এই জগতের সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে? কে সৃষ্টি করেছেন এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎকে? কি দিয়ে এই জগতের সৃষ্টি হয়েছে? এই জগতের শেষ কোথায়? তা কি কালের নিয়মে একসময় হারিয়ে যাবে? কীভাবে এই জগতের ধ্বংস হতে পারে? এত যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তথা অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, খরা, ভূ-কম্প, বিধ্বংসী ঝড়, বজ্রপাত, আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্গিরণ, দাবানল – এসবের কারণ কি? এমন হাজার প্রশ্ন সেই আদিকাল হতে মানুষকে ভাবিয়ে আসছে। কাজেই জগৎ-বিষয়ক আলোচনাটি সেই সুপ্রাচীন কাল হতে শুরু করে বর্তমান দিনেও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সুপ্রাচীন কাল হতে আদ্যাবধি মানুষ জগৎকে জানার হাজার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও জগতের কতটুকুই বা জানা সম্ভব হয়েছে? আমাদের মত সসীম জীব বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এই জগতের ভগ্নাংশমাত্রকে জানতে সক্ষম হয়েছে। এর বাইরে যে প্রতিদিন সহস্রাধিক ঘটনা ঘটেই চলেছে তার হদিশ আমরা কেউ পাই না। কাজেই জগতের প্রকৃত স্বরূপ যাতে আমরা জানতে পারি সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিদৃশ্যমান জগৎ-কে অবলম্বন করে আমার এই গবেষণা নিবন্ধ।

বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন করতে গিয়ে আমি মূলত পাঁচটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিষয়টা উপস্থাপন করেছি। প্রথম অধ্যায়ে আমরা মূলত আলোকপাত

করেছি ‘ভারতীয়দর্শনে পদার্থতত্ত্ব’-এর ওপর। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মূলত ‘বৈশেষিক-দর্শনে পদার্থতত্ত্ব’ এর ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ‘বৈশেষিক-দর্শনে জগৎ ঃ সৃষ্টি ও প্রলয়’ এই বিষয়ের ওপর যথামতি আলোচনা করেছি। চতুর্থ অধ্যায়ে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎ ঃ সৃষ্টি ও প্রলয়’ বিষয়ের ওপর কথঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। পঞ্চম অধ্যায়ে মূলত আমার সমগ্র কাজটি পর্যালোচনা পূর্বক বৈশেষিক-দর্শনের যে বিশেষত্ব, যা তাকে আজও ভারতীয়দর্শন চর্চার আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের স্থান দিয়েছে, তা বর্ণনার চেষ্টা করেছি।

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয়দর্শনে পদার্থতত্ত্ব

ভারতীয়দর্শনসম্প্রদায়গুলি মূলত দ্বিধাবিভক্ত, যথা– আস্তিক ও নাস্তিক। *মনুস্মৃতি*তে বলা হয়েছে – 'নাস্তিকো বেদনিন্দকঃ'[১] অর্থাৎ যাঁরা বেদকে নিন্দা করেন, বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসাবে স্বীকার করেন না, তাঁরা হলেন নাস্তিক। অপরপক্ষে যাঁরা বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থের মান্যতা প্রদান করেন, তাঁরা হলেন আস্তিক। ভারতীয়দর্শনের এই দ্বিবিধ ধারার অন্তর্ভুক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলির আলোচ্য বিষয়ের ভেদ হেতু তাঁদের পদার্থ-বিষয়ক আলোচনায় মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। অভিপ্রায় এই যে, প্রতিটি ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়ের নিজস্ব কিছু আলোচ্য বিষয় রয়েছে। আর যে পদার্থসমূহ যে সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত বিষয় প্রতিপাদনে সহায়ক, সেই দর্শন সেই সেই পদার্থের আলোচনা করেছেন। আর যে সমস্ত পদার্থ যে সমস্ত দর্শনের অভিপ্রেত বিষয় উপপাদনে উপযোগী নয়, সেই সমস্ত দর্শনে সেই সমস্ত পদার্থের আলোচনা হয়নি। যাই হোক, আমার গবেষণার মূল বিষয় হল বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন। এখন আমরা জানি জগৎ ও জাগতিক বিষয়সমূহ একে অপরের পরিপূরক। জগৎকে বাদ দিয়ে যেমন জাগতিক বিষয়সমূহের কল্পনা সম্ভব হয় না; তদনুরূপ জাগতিক বিষয়শূন্য জগতের ধারণাটি অর্থহীন। তাই জগতের স্বরূপ অনুধাবন করতে গেলে জাগতিক বিষয়সমূহের আলোচনা এসে পড়ে। যদিও আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে জগতের স্বরূপ অনুধাবন। কাজেই, পদার্থ-বিষয়ে বৈশেষিক-দর্শনের অভিমত এস্থলে প্রাসঙ্গিক মনে হলেও বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বকে সম্যগ্‌ভাবে অনুধাবন করতে হলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক বর্ণিত পদার্থ-বিষয়ক অভিমত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ধারণা থাকা আবশ্যক। ভারতীয় শাস্ত্রে যেমন আত্মার স্বরূপ বোঝার জন্য আত্মেতর

[১] সপ্ততীর্থ, শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১, পৃষ্ঠা – ১০৩।

পদার্থ-সকলের নিরূপণ করা হয়েছে, তদনুরূপ বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বকে বুঝতে গেলে অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়গুলির পদার্থ-বিষয়ক যে অভিমত তা আলোচনা করা প্রয়োজন। কেননা, অন্যান্য ভারতীয়দর্শন সম্প্রদায়গুলির পদার্থ-বিষয়ক অভিমতের সঙ্গে বৈশেষিক-সম্মত পদার্থতত্ত্বের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনুধাবনের মধ্য দিয়েই বৈশেষিকাচার্যগণের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত সম্পর্কে যথার্থরূপে অবহিত হওয়া যাবে। তাই এখন ভারতীয়-দর্শনে আস্তিক-নাস্তিকভেদে যে নয়টি সম্প্রদায় রয়েছে তাঁদের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত তা এই অধ্যায়ে আলোচনা করব। একই সঙ্গে আয়ুর্বেদশাস্ত্রাদি শাস্ত্রে পদার্থ-বিষয়ক যে অভিমত রয়েছে, তাও কিঞ্চিৎ আলোচনা করর।

পদার্থ-বিষয়ে চার্বাক-দর্শনের অভিমতঃ

চার্বাকমতে, ঘট-পটাদি অসংখ্য পদার্থসমন্বিত আমাদের এই জগৎ, যা ইন্দ্রিয়গম্য। যার ইন্দ্রিয়গম্যতা নেই তার অস্তিত্ব চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। যেমন, অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর, আত্মা, স্বর্গ, নরক, পরলোক ইত্যাদি চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত হয়নি, যেহেতু এগুলির ইন্দ্রিয়গম্য নয়। চার্বাকগণ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং জগৎ -এর যাবতীয় বস্তুসমূহের মূল উপাদান হিসাবে চারটি তত্ত্ব স্বীকার করেন, যথা - পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু। *বার্হস্পত্যসূত্রতে* বলা হয়েছে –'পৃথিব্যপ্তেজো বায়ুরিতি তত্ত্বানি'[২]।

বৈশেষিক-দর্শনে আকাশকে একটি বিভুদ্রব্য বলে স্বীকার করা হলেও চার্বাক দর্শনে আকাশকে পদার্থ হিসাবেই স্বীকার করা হয় না। কারণ চার্বাক দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষকেই একমাত্র প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু আকাশ প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। চার্বাক দর্শনে যা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু যা প্রত্যক্ষের দ্বারা গ্রাহ্য নয় তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়নি। পৃথিব্যাদি ভূতচতুষ্টয় প্রত্যক্ষগ্রাহ্য। পৃথিবী, জল ও তেজের রূপ ও স্পর্শ আছে; বায়ুর রূপ না থাকলেও স্পর্শ আছে, তাই এগুলি চার্বাক দর্শনে পদার্থ হিসাবে

[২] শাস্ত্রী, দক্ষিণারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩, পৃষ্ঠা – ১৮৭।

স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু আকাশের উদ্ভুত রূপ কিংবা স্পর্শ না থাকায়, তা প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। তাই চার্বাকগণ আকাশকে পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন না।

পদার্থ-বিষয়ে বৌদ্ধ-দর্শনের অভিমতঃ

ভারতীয়দর্শন চর্চার ইতিহাসে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের দার্শনিক চিন্তা একটি বিশিষ্ট স্থান জুড়ে রয়েছে। প্রচলিত বেদবাদ ও ব্রাহ্মন্যবাদের তীব্র বিরোধিতা করে এই দর্শন আত্মপ্রকাশ করেছিল। বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণের পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধ দর্শন কতকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের মধ্যে চারটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, যথা – বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার এবং শূন্যবাদী। এই চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের নানা মৌলিক বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন, বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক-সম্প্রদায় ছিলেন হীনযানী, এনারা বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে বস্তুবাদী মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মতে বাহ্যবস্তু জ্ঞান-নিরপেক্ষভাবে অস্তিত্বশীল। অপরদিকে মহাযানী সম্প্রদায়ভুক্ত যোগাচার সম্প্রদায় বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব বিষয়ে ভাববাদী মনোভাব পোষণ করতেন। এঁদের মতে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান-নিরপেক্ষ কোনও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই, একমাত্র বিজ্ঞানই অস্তিত্বশীল। তাই এনারা বিজ্ঞানবাদী নামে পরিচিত ছিলেন। আবার এক সম্প্রদায় বাহ্যজগৎ -এর শূন্যত্বে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা মূলত শূন্যবাদী নামে খ্যাত ছিলেন।

পদার্থ-বিষয়ে জৈন-দর্শনের অভিমতঃ

জৈনমতে আমাদের জগৎ যে সমস্ত পদার্থ দ্বারা পরিব্যাপ্ত সেগুলিকে মূলত দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা – জীব ও অজীব। জৈনমতে যা বোধাত্মক অর্থাৎ যার চেতনা জনিত বোধ আছে তা হল জীব। আর যা অবোধাত্মক অর্থাৎ যার চেতনা জনিত বোধ নেই তা হল অজীব। জীবকে আবার দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা – মুক্ত ও সংসারী বা বদ্ধ। যিনি কর্মবন্ধন হতে নিজেকে মুক্ত করেছেন অর্থাৎ যিনি দীর্ঘ ধ্যান, তপস্যাদির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে কর্মক্ষয় করে মুক্তিলাভ করেছেন, তিনি হলেন মুক্ত জীব। এই মুক্ত জীব অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত দর্শন, অনন্ত বীর্য, অনন্ত আনন্দের অধিকারী। অপরদিকে কর্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে ভ্রমন করে যে জীব, তারা হল সংসারী বা বদ্ধ জীব।

এই সংসারী জীব আবার জৈন মতে দু'প্রকার, যথা – সমনস্ক ও অমনস্ক। যার মন আছে তাকে সমনস্ক জীব আর যার মন নেই তাকে অমনস্ক জীব বলা হয়। সংসারী জীবকে আরও একভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়, যথা – ত্রস ও স্থাবর। জৈনদর্শনে অজীবকে পাঁচভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – ধর্মাস্তিকায়, অধর্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায় এবং কাল।

পদার্থ-বিষয়ে সাংখ্য-দর্শনের অভিমতঃ

দর্শনে দু'টি মূল তত্ত্ব স্বীকার করা হয়েছে – যথা, পুরুষ ও প্রকৃতি। সাংখ্যমতে এ জগৎ ও জগৎ-এর যাবতীয় বস্তুসমূহ প্রকৃতিরই পরিণামমাত্র[৩]। 'প্রকৃতি' শব্দটির ব্যুৎপত্তি করা হয় – 'প্রকরোতি যা সাঃ প্রকৃতিঃ' অর্থাৎ যা প্রকৃষ্টরূপে কারণ হয় তাই প্রকৃতি। অভিপ্রায় এই যে, আমাদের জগৎ -এর প্রতিটি বস্তুই জন্য পদার্থ অর্থাৎ কোনও কারণ দ্বারা উৎপন্ন। তাই তাদেরকে সঙ্ঘাত বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতি হল অকারণক। তা সবকিছুর কারণ হলেও তার র কোনও কারণ বা মূল নেই। 'বিকৃতি' শব্দটির অর্থ হল যা কার্য। অভিপ্রায় এই যে, যে তত্ত্বগুলি কেবল কার্য হয়, কারও কারণ হয় না, তাদেরকে বিকৃতি বলা হয়। সাংখ্যমতে "ষোড়শকস্তু বিকারঃ" অর্থাৎ বিকার ষোল প্রকার। সাংখ্যমতে যা কখনও কখনও কারণ আবার কখনও কখনও কার্য হয়, তা 'প্রকৃতি-বিকৃতি' পদবাচ্য। মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র – এই সপ্তবিধ তত্ত্বকে সাংখ্যদর্শনে 'প্রকৃতি-বিকৃতি' বলা হয়েছে। সর্বশেষ তত্ত্ব হল অনুভয়। অর্থাৎ যা প্রকৃতিও নয়, বিকৃতিও নয়, তা হল পুরুষ। অভিপ্রায় এই যে, সাংখ্য-স্বীকৃত পুরুষ যেমন কোনওকিছুর কার্য হয় না, তদনুরূপ কোনওকিছুর কারণও হয় না। তাই তাকে অনুভয় রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

[৩] 'উপাদানসমসত্তাককার্যাপত্তি' অর্থাৎ উপাদানের সমান সত্তা বিশিষ্ট কার্যাকার প্রাপ্তিই হল পরিণাম। যেমন – দুগ্ধের দধিভাব প্রাপ্তি। এস্থলে দধি হল দুগ্ধের পরিণাম। কারণ দুগ্ধটাই দধিতে পরিণত হয়। তদনুরূপ মূল কারণ যে অব্যক্ত প্রকৃতি তা জগৎরূপে অভিব্যক্ত হয়। তাই জগৎ হল প্রকৃতির পরিণাম।

পদার্থ-বিষয়ে যোগ-দর্শনের অভিমতঃ

পদার্থ-বিষয়ে যোগদর্শনের সিদ্ধান্ত সাংখ্যদর্শনের প্রায় অনুরূপ। মূল জড় প্রকৃতি, মহৎতত্ত্ব, অহংকারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র (রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, গন্ধতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দতন্মাত্র), একাদশ ইন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক, মন, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ), পঞ্চমহাভূত (ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ) এবং চেতন পুরুষ – সাংখ্য-স্বীকৃত এই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব যোগদর্শনেও স্বীকৃত। এতদতিরিক্ত যোগদর্শনে ঈশ্বর নামক একটি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তাই যোগদর্শনকে 'সেশ্বর-সাংখ্য' বলা হয়।

পদার্থ বিষয়ে মীমাংসা-দর্শনের অভিমতঃ

'মানমেয়োদয়ঃ' গ্রন্থে বলা হয়েছে - 'বয়ং তাবৎ প্রমেয়ং তু দ্রব্যজাতিগুণক্রিয়াঃ। অভাবশ্চেতি পঞ্চৈতান্ পদার্থানাদ্রিয়ামহে'[৪] অর্থাৎ প্রমেয় পাঁচ প্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি বা সামান্য এবং অভাব। কিন্তু প্রাভাকরগণ ভাট্টসম্মত পঞ্চবিধ পদার্থের মধ্যে অভাবকে স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকারই করেন না। পরন্তু ভাট্ট-সম্প্রদায় স্বীকৃত দ্রব্য, গুণ, কর্ম, জাতি বা সামান্য অতিরিক্ত সমবায়, শক্তি, সংখ্যা এবং সাদৃশ্যকেও স্বতন্ত্র পদার্থ হিসাবে স্বীকার করেন। কাজেই প্রভাকরমতে প্রমেয় বা পদার্থ আটপ্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায়, শক্তি, সংখ্যা ও সাদৃশ্য। *তন্ত্ররহস্যে* বলা হয়েছে – 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যসমবায়শক্তিসংখ্যাসাদৃশ্যান্যষ্টৌ পদার্থাঃ'[৫]। কুমারিলভট্ট ন্যায়-বৈশেষিকস্বীকৃত সপ্তপদার্থের মধ্যে বিশেষ ও সমবায়কে স্বীকারই করেননি, যদিও প্রাভাকরগণ সমবায়ের পৃথক পদার্থত্ব স্বীকার করেছেন।

পদার্থ-বিষয়ে বিভিন্ন বৈদান্তিক-সম্প্রদায়ের অভিমতঃ

বহু পুণ্যাত্মা ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, যাঁরা নিজ নিজ আঙ্গিকে উপনিষদসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান এবং ব্রহ্মসূত্রের ওপর নানা ভাষ্য রচনা করেছিলেন। মূল কথা হল, তাঁরা

---

[৪] ঐ, পৃষ্ঠা – ২৩১।

[৫] Shamashastry, R. *Tantrarahasya* by Ramanujacharya, Baroda, Central Library, 1923, page – 20.

নিজ নিজ আঙ্গিকে বেদান্তদর্শনের মূল সত্য প্রচার করেছিলেন। ফলস্বরূপ বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন মতবাদ পরিদৃষ্ট হয়। এগুলির মধ্যে আচার্য শঙ্করের 'অদ্বৈতবাদ'; রামানুজাচার্যের 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'; মধ্বাচার্যের 'দ্বৈতবাদ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অদ্বৈত মতঃ

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেব হতে আচার্য গৌড়পাদ, আচার্য শঙ্কর প্রমুখ মহান আত্মা যে দর্শন সম্প্রদায়ের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন, তা অদ্বৈত বেদান্ত-দর্শন নামে পরিচিত। তবে শঙ্করাচার্য প্রচারিত অদ্বৈত তত্ত্বই অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। তাই অদ্বৈতদর্শনের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনা প্রসঙ্গে মূলত আচার্য শঙ্কর প্রচারিত দর্শনের পদার্থ-বিষয়ক অভিমত আলোচনা করব। আচার্য শঙ্কর মূলত যা দুই-এর ভাব বর্জিত, এরূপ এক-অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতে পারমার্থিক দৃষ্টিতে তত্ত্ব মূলত এক, তিনি হলেন ব্রহ্ম। কেবল ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব হিসাবে স্বীকৃত হওয়ায় তাঁর দর্শনকে কেবলাদ্বৈত-দর্শন নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। তা হলে প্রশ্ন হতে পারে, শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকেই যদি একমাত্র তত্ত্ব রূপে স্বীকার করে থাকেন তা হলে ঘট, পটাদি অসংখ্য পদার্থ সমন্বিত আমাদের এই যে জগৎ, এই জগতে অবস্থান করেও তিনি কি ঘট, পটাদি পদার্থসমূহের অস্তিত্বকে অস্বীকার করবেন? এর উত্তরে বলা যায়, যদি সামগ্রিকভাবে আমরা শাঙ্করদর্শন পর্যালোচনা করি তা হলে বুঝতে পারবো, তিনি দু'ভাবে পদার্থের আলোচনা করেছেন – পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে। পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পদার্থ বা তত্ত্ব একটিই, তিনি হলেন ব্রহ্ম। কিন্তু ব্যাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের ন্যায় দ্রব্যাদি তথা দ্রব্য, গুণ, কর্ম, অভাব প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার করেছেন। তবে বৈশেষিক-সম্মত সমবায়কে তাঁরা পদার্থরূপে স্বীকারই করেন না।

বিশিষ্টাদ্বৈ মতঃ

শ্রীভাষ্যকার রামানুজ যে বেদান্ত-দর্শনের প্রধান প্রচারক ছিলেন, তা বিশিষ্টাদ্বৈত-দর্শন নামে পরিচিত। শঙ্করাচার্যের ন্যায় আচার্য রামানুজ এক ও অদ্বয় তত্ত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মতেও পরমেশ্বর এক ও দ্বিতীয়রহিত। তবে শঙ্করাচার্য নির্গুণব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁর

মতে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্গুণ ও নিরবয়ব। কিন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব অবিদ্যাবশতঃ নির্গুণ ব্রহ্মে জগৎকর্তৃত্বাদি নানা গুণের আরোপ করে। তবে অজ্ঞানরূপী মেঘের চাদর অপসারিত হলে এক, অদ্বয় ও অপরিণামী ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জীবের নিকট প্রকাশিত হয়। তবে রামানুজের মতে ব্রহ্ম (ঈশ্বর) সগুণ, চিৎ ও অচিৎ তাঁর বিশেষণ। কাজেই রামানুজাচার্যের মতে তত্ত্ব বা পদার্থ তিন প্রকার – যথা, চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর।

মাধ্ব মতঃ

আচার্য মাধ্ব বৈশেষিকাচার্যগণের ন্যায় জাগতিক পদার্থসমূহের শ্রেণীকরণ করেছেন। তবে পদার্থের শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে উভয়-মতের বৈসাদৃশ্য পরিদৃষ্ট হত। বৈশেষিকমতে পদার্থ সপ্তবিধ, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। তবে মাধ্বাচার্য ঈশ্বরাধীন যে জাগতিক পদার্থসমূহ সেগুলি শ্রেণীকরণের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে প্রাভাকর-মীমাংসা দর্শনের মত অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতে পদার্থ দশ প্রকার, যথা, দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, বিশিষ্ট, অংশী, শক্তি, সাদৃশ্য ও অভাব। কাজেই তিনি বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে ষট্-পদার্থকে মেনেছেন। তবে অন্যান্য বৈদান্তিকগণের ন্যায় তিনিও সমবায়কে স্বতন্ত্র-পদার্থরূপে স্বীকার করেননি। এতদ্ অতিরিক্ত মীমাংসা-সম্মত শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে মীমাংসা-সম্মত শক্তি ও মাধ্ব-স্বীকৃত শক্তির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। মীমাংসকগণ কার্যোৎপাদন সামর্থ্যকে শক্তি বলেন। কিন্তু আচার্য মাধ্বমতে শক্তি চার প্রকার, যথা – অচিন্ত্যশক্তি, আধেয়শক্তি, সহজশক্তি এবং পদশক্তি।

পদার্থ-বিষয়ে আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রের অভিমতঃ

আয়ুর্বেদ তন্ত্রের ওপর যে সমস্ত গ্রন্থগুলি সহজলভ্য সেগুলির মধ্যে চরকসংহিতাই প্রাচীনতম এবং দার্শনিক আলোচনায় সম্পৃক্ত। তাই *চরকসংহিতা*সম্মত পদার্থতত্ত্বই এস্থলে আলোচ্য। ধাতুবৈষম্য দূর করার নিমিত্ত অর্থাৎ জীবের সমস্ত প্রকার শারীরিক ও মানসিক দুঃখসমূহ নিবৃত্তির-নিমিত্ত এবং সুন্দর ও সুস্বাস্থ্যময় জীবন প্রদানের জন্য আবশ্যকরূপে চরকসংহিতাতে সামান্যাদি ষড়্বিধ পদার্থের উপদেশ করা হয়েছে। *চরকসংহিতা*তে বলা

হয়েছে – 'সামান্যঞ্চ বিশেষঞ্চ গুণান্ দ্রব্যাণি কর্ম্ম চ। সমবায়ঞ্চ তজ্‌জ্ঞাতা তন্ত্রোক্তং বিধিমাস্থিতাঃ। লেভিরে পরমং শর্ম্ম জীবিতঞ্চাপ্যনশ্বরম্'[৬]। আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও সমবায় – এই ষড়্‌বিধ পদার্থ-বিষয়ে যথাযথ অবগত হয়ে ব্যক্তি যদি আয়ুর্বেদতন্ত্রের সমস্ত বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করেন তা হলে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী সুখ এবং হিতকর আয়ু লাভ হবে। কাজেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র মতে পদার্থ ষড়্‌বিধ, যথা – সামান্য, বিশেষ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম এবং সমবায়।

[৬] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে পদার্থতত্ত্ব

বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের আলোকে জগতের ব্যাখ্যা অনুধাবন আমার গবেষণার মূল প্রতিপাদ্য হওয়ায়, এই অধ্যায়ে বৈশেষিক-পদার্থতত্ত্বের সুবিশ্লেষিত আলোচনা সঙ্গত মনে করেছি। কারণ বৈশেষিক-সম্মত পদার্থসমূহের স্বরূপ না বুঝলে সেই পদার্থতত্ত্ব জগৎ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কতটা প্রাসঙ্গিক কিংবা কীভাবে প্রাসঙ্গিক তা বোঝা যাবে না। তাই এই অধ্যায়ে মূলত বৈশেষিক পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে আলোকপাত করব। বৈশেষিক-দর্শনের দ্রষ্টা হলেন মহর্ষি কণাদ। মহর্ষি কণাদকৃত বৈশেষিক-দর্শন প্রমেয়শাস্ত্র রূপে পরিগণিত। যেহেতু প্রমেয়-সমূহ ই এই শাস্ত্রের মূল প্রতিপাদ্য। 'প্রমেয়' মানে যা প্রমা-জ্ঞানের বিষয়। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের বিষয়রূপে পরিদৃশ্যমান জগতের বহু বস্তুই প্রতীত হয়, যেগুলিকে বৈশেষিকাচার্যগণ পদার্থ নামে অভিহিত করেছেন।

'পদস্য অর্থঃ পদার্থ' অর্থাৎ পদের অর্থ হল পদার্থ। মানুষ, বৃক্ষ, নদ ইত্যাকারক শব্দসমূহই পদ। এই পদ যে বস্তুকে নির্দেশ করে তা হল সেই পদের অর্থ। যেমন, মানুষ পদটি রাম, শ্যামাদি মানুষকে নির্দেশ করে; তদনুরূপ বৃক্ষ পদটি বট, নিমাদি বস্তুকে নির্দেশ করে। কাজেই রাম, শ্যাম, বট ইত্যাদি যাবৎ বস্তু সমূহই পদার্থ । 'পদার্থ' শব্দটির অন্তর্গত 'অর্থ' পদটির দ্বারাই পদার্থের লক্ষণ বলা হয়েছে 'অভিধেয়ত্ব'। *অমরকোশে* বলা হয়েছে, 'অর্থঽভিধেয়রৈবস্তুপ্রয়োজননিবৃত্তিষু'[৭] অর্থাৎ অর্থ শব্দ অভিধেয়, ধন, বস্তু, প্রয়োজন ও নিবৃত্তির বাচক। সুতরাং অর্থ পদের দ্বারাই পদার্থের সামান্যলক্ষণ সূচিত হয়েছে – অভিধেয়ত্ব। অভিধেয়ত্ব মানে অভিধাশক্তিবিষয়ত্ব। অনেকে অর্থ পদের ব্যুৎপত্তির দ্বারা পদার্থের আরও একটি লক্ষণ সূচিত করেন। তাঁদের অভিমত হল - ঋগতৌ ঋ ধাতুর উত্তর থ (ঔণাদি থ) প্রত্যয় যোগে 'অর্থ' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। 'ঋ' ধাতুর অর্থ গতি। এখন

[৭] *Sastri, Pt. Hargovinda, Amarkosa, Varanasi, Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1998, page- 453.*

নিয়ম আছে গত্যর্থক ধাতু জ্ঞানার্থকও হয়। কাজেই 'ঋ' ধাতুর অর্থ হয় জ্ঞান। আর 'থ' প্রত্যয়ের অর্থ হয় বিষয়তা। সুতরাং 'অর্থ' শব্দটির ব্যুৎপত্তি হল জ্ঞানবিষয়ত্ব। অভিপ্রায় হল, যা জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যা জ্ঞেয় তাই পদার্থ। এমতাবস্থায় আপত্তি ওঠা অসঙ্গত নয় যে, এমন অনেক বস্তু থাকতে পারে যা আমাদের জ্ঞানের বিষয় নয় তথা যা জ্ঞেয় নয়, সেক্ষেত্রে উক্তরূপ অজ্ঞাত বস্তুমাত্রকে পদার্থ বলা কি সঙ্গত হবে? এর উত্তরে আচার্য্যগণ বলেন, সব বস্তু জ্ঞেয় না হলেও, অন্ততঃ জ্ঞাত হওয়ার যোগ্যতা আছে। তাছাড়া ঈশ্বর হলেন সর্বজ্ঞ, এ জগতের এমন কোনও কিছুই নেই যা তাঁর জ্ঞানের বিষয় নয়। সব বস্তুই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয় হয়েই অবস্থান করে। তাই জ্ঞানবিষয়ত্বই হল পদার্থের লক্ষণ। তদনুরূপ প্রমেয়ত্ব, বাচ্যত্বও পদার্থের লক্ষণ হতে পারে। 'প্র ' পূর্বক 'মা' ধাতুর সঙ্গে 'ক্তিন' প্রত্যয়যোগে 'প্রমিতি' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ হল প্রকৃষ্ট বা যথার্থ জ্ঞান। আর সেই যথার্থ জ্ঞানের যা বিষয় তা হল পদার্থ।

ন্যায় পদার্থতত্ত্বঃ

যদিও এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় 'বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে পদার্থতত্ত্ব'; তথাপি বৈশেষিক-দর্শনের সঙ্গে ন্যায়-দর্শনের সমানতন্ত্রতা বশতঃ এবং প্রামাণ্য শাস্ত্র রূপে ন্যায়-শাস্ত্রের গ্রহণযোগ্যতা সর্বসম্মত হওয়ায়, প্রথমে ন্যায়-দর্শনসম্মত পদার্থতত্ত্বের যৎকিঞ্চিত আলোচনা এখানে সঙ্গত মনে করছি। ন্যায়-দর্শন মোক্ষানুগামী, তাই তাঁদের মতে মোক্ষ বা মুক্তি জীবমাত্রেরই পরম অভিপ্রেত। জীবের সর্ব প্রকার দুঃখ হতে আত্যন্তিক পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ মহর্ষি গৌতম তাঁর '*ন্যায়সূত্র* গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের প্রথম সূত্রটির অবতারণা করেছেন। প্রথম সূত্রটি হল – 'প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্ত-অবয়ব-তর্ক-নির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাসচ্ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ'[৮]। অভিপ্রায় এই যে, ন্যায়মতে পদার্থ ষোল প্রকার, যথা – প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি ও নিগ্রহস্থান। এই ষোড়শ-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান হতেই জীবের মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে। তবে এখানে এমন মনে

[৮] তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১, পৃষ্ঠা- ১৮-১৯।

করা যথাযথ হবে না যে ন্যায়মতে পদার্থ ষোল প্রকার। ন্যায়সম্মত মোক্ষপ্রাপ্তির সহায়ক পদার্থ যে ষোল প্রকার তা মহর্ষি গৌতমের উক্ত সূত্রের মূল বক্তব্য। এখন ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল –

প্রমাণঃ

ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল **প্রমাণ**। 'প্র'পূর্বক 'মা' ধাতুর উত্তর করণবাচ্যে 'ল্যুট' প্রত্যয় যোগে প্রমাণ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট, আর 'মা' ধাতুর অর্থ জ্ঞান। কাজেই 'প্রমা' শব্দটির অর্থ হবে প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা যথার্থ জ্ঞান। যথার্থ জ্ঞান আবার স্মৃতি ও অনুভব ভেদে দ্বিবিধ হওয়ায়, আর স্মৃতি পূর্বানুভব নির্ভর হওয়ায়; ন্যায়মতে যথার্থ অনুভবই প্রমা। আর এই প্রমার করণকেই প্রমাণ বলা হয়। *ন্যায়সূত্রে* বলা হয়েছে 'প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি'[৯] অর্থাৎ ন্যায়মতে প্রমাণ চার প্রকার, যথা – প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ।

প্রমেয়ঃ

মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে দ্বিতীয় পদার্থ হল **প্রমেয়**। 'প্র' মানে প্রকৃষ্ট আর 'মেয়' মানে জ্ঞেয়(জ্ঞানের বিষয়)। কাজেই যা প্রকৃষ্টমেয় অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞেয়, যাদের তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপ তত্ত্বজ্ঞান ঐ বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্তি ক্রমে মোক্ষের প্রকৃষ্ট কারণ হয়, তাদের প্রমেয় বলেছেন। এই প্রমেয়সমূহের তত্ত্বজ্ঞান অনন্যনিরপেক্ষরূপে মোক্ষের জনক হয়। আর প্রমাণাদি পদার্থসমূহ প্রমেয়-পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের সহায়ক হয়ে পরম্পরায় নিঃশ্রেয়সের হেতু হয়। যে পদার্থগুলির তত্ত্বজ্ঞান প্রকৃষ্টরূপে নিঃশ্রেয়সের হেতু হয়, সেই পদার্থসমূহকে মহর্ষি দ্বাদশ প্রকারে বিভক্ত করেন। তিনি বলেন – 'আত্ম-শরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্যভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্'[১০] অর্থাৎ ন্যায়মতে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ ও অপবর্গ – প্রমেয় এই দ্বাদশ প্রকারের। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণতঃ প্রমা-জ্ঞানের যা বিষয় হয় তাকে প্রমেয় বলা

[৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ৮৩।

[১০] ঐ, পৃষ্ঠা- ১৯৭।

হয়; কিন্তু মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত দ্বিতীয় পদার্থ যে 'প্রমেয়' তা বিশেষ অর্থে প্রয়োগ করেছেন। তাঁর মতে এ জগতে অসংখ্য প্রমেয় থাকতে পারে তবে যেগুলি 'প্রকৃষ্টমেয়'; অর্থাৎ যাদের তত্ত্বজ্ঞান সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তিক্রমে মোক্ষের সহায়ক হয়, তাদেরকে বিশেষ অর্থে মহর্ষি 'প্রমেয়' নামে অভিহিত করেছেন। অভিপ্রায় এই যে, দ্বাদশ প্রমেয়ের তত্ত্বজ্ঞানজন্য সেই বিষয়ে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে দোষ তার নিবৃত্তি হবে। দোষের নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে প্রবৃত্তি তার নিবৃত্তি হবে। প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হলে তজ্জন্য যে জন্ম তার নিবৃত্তি হবে। আর জন্ম না থাকে তজ্জন্য যে দুঃখ তার র সম্ভাবনা থাকবে না। এই অভিপ্রায়েই মহর্ষি গৌতম বলেছিলেন – 'দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ'[১১]।

সংশয়ঃ

যে সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষলাভের সহযোগী সেগুলির মধ্যে তৃতীয় পদার্থ হল **সংশয়**। মহর্ষি গৌতম সংশয়ের লক্ষণ দিয়েছেন এভাবে - 'সমানানেকধর্ম্মোপপত্তর্ব্বিপ্রতিপত্তেরুপলব্ধ্যনুপলব্ধ্যব্যবস্থাতশ্চ বিশেষাপেক্ষো বিমর্শঃ সংশয়ঃ'[১২]। 'বি' শব্দের অর্থ হল বিরোধ, আর 'মৃশ' ধাতুর অর্থ হল জ্ঞান। কাজেই 'বিমর্শ' শব্দের অর্থ হল নানা বিরুদ্ধ পদার্থের জ্ঞান। একই ধর্মীতে নানা বিরুদ্ধ ধর্মপ্রকারক জ্ঞানকেই সংশয় বলে। যেমন, 'অয়ং স্থাণুর্বা পুরুষো বা' অর্থাৎ এটি স্থাণু অথবা পুরুষ – এরূপ সংশয় স্থলে ইদং তথা সম্মুখস্থ বস্তুটি হল বিশেষ্য। আর স্থাণুত্ব এবং পুরুষত্ব ঐ মুখ্য বিশেষ্যের বিশেষণ রূপে জ্ঞানের বিষয় হয়েছে। উক্ত ধর্ম দু'টি পরস্পরের বিরুদ্ধধর্ম। কারণ কোনও ধর্মীতে স্থাণুত্ব থাকলে পুরুষত্ব থাকতে পারবে না, অনুরূপভাবে পুরুষত্ব থাকলে স্থাণুত্ব থাকবে না। তাই সংশয়কে একধর্মীবিশেষ্যক নানা বিরুদ্ধধর্মপ্রকারক জ্ঞান বলা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীনমতে সংশয় হল বিরুদ্ধভাবকোটিক। তবে নব্যমতে সংশয় বিরুদ্ধ ভাবাভাবকোটিক। তাঁদের মতে সংশয়ের আকার হল- 'অয়ং স্থাণুর্নবা, অয়ং পুরুষো

[১১] ঐ, পৃষ্ঠা- ৬৩-৮২।

[১২] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৫০।

ন বা'। ন্যায়মতে সংশয় পাঁচ প্রকার, যথা – সমানধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, অসাধারণ ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর জ্ঞানজন্য সংশয়, বিপ্রতিপত্তিজন্য সংশয়, উপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয় এবং অনুপলব্ধির অব্যবস্থাজন্য সংশয়।

প্রয়োজনঃ

ন্যায়সম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে **প্রয়োজন** হল চতুর্থ পদার্থ। যে পদার্থের জন্য জীব কর্মে প্রবৃত্ত হয় তাকে প্রয়োজন বলা হয়েছে। প্রয়োজন ব্যতীত কোনও জীবই কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। তিনি 'প্রয়োজন' পদার্থটির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'যমর্থমধিকৃত্য প্রবর্ত্ততে তৎ প্রয়োজনম্'[১৩] অর্থাৎ যে পদার্থকে গ্রাহ্য বা ত্যাজ্য রূপে নিশ্চয় করে জীব কর্মে(প্রাপ্তি ও পরিত্যাগের) উপায়ে প্রবৃত্ত হয় তাকে প্রয়োজন বলে। ন্যায়মতে প্রয়োজন দ্বিবিধ – মুখ্য প্রয়োজন ও গৌণ প্রয়োজন।

দৃষ্টান্তঃ

ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত পঞ্চম পদার্থ হল **দৃষ্টান্ত**। মহর্ষি গৌতম দৃষ্টান্ত পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'লৌকিকপরীক্ষকাণাং যস্মিন্নর্থে বুদ্ধি-সাম্যং স দৃষ্টান্তঃ'[১৪]। অর্থাৎ যে পদার্থে লৌকিক(বোধয়িতা) এবং শাস্ত্রদ্ধবোদ্ধা) পুরুষের বুদ্ধির সাম্য থাকে তাকে দৃষ্টান্ত পদার্থ বলে। অভিপ্রায় এই যে, বিচারস্থলে যে পদার্থটি বোদ্ধা এবং বোধয়িতা উভয়ের নিকট প্রমাণসিদ্ধ অর্থাৎ উভয়েই স্বীকার করেন তাকেই দৃষ্টান্ত বলা হয়। যেমন, শব্দ অনিত্য যেহেতু তা উৎপন্ন হয়, যেমন – ঘট; প্রদত্ত স্থলে শব্দের অনিত্যতা প্রতিপাদন করা হচ্ছে উৎপত্তিমত্ব হেতুর সাহায্যে এবং সেক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটকে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ ঘট উৎপন্ন হয় বলে যে অনিত্য তা লৌকিক কিংবা শাস্ত্রজ্ঞ সকল পুরুষই স্বীকার করেন। কাজেই বিচারস্থলে উপস্থিত সমস্ত ব্যক্তিবর্গের যাতে

[১৩] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৪।

[১৪] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৬।

বুদ্ধিসাম্য আছে তথা যা সবার নিকট স্বীকৃত, এমন পদার্থকেই দৃষ্টান্ত বলা হয়েছে। ন্যায়মতে দৃষ্টান্ত দু'প্রকার, যথা – সাধর্ম্য-দৃষ্টান্ত এবং বৈধর্ম্য-দৃষ্টান্ত।

সিদ্ধান্তঃ

ন্যায়মতে **সিদ্ধান্ত** হল ষষ্ঠ পদার্থ। আমরা জানি বাদী কিংবা প্রতিবাদী কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্যই বিচারে প্রবৃত্ত হন। কাজেই বিচারের ফল হল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা। তাই বিচারস্থলে সিদ্ধান্তরূপ পদার্থটি অবশ্য স্বীকার্য। মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্তের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমসংস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ'[১৫]। 'তন্ত্র' তথা শাস্ত্র যার অধিকরণ এবং যাকে নিশ্চিতরূপে স্বীকার করা হয় তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। অর্থাৎ যা শাস্ত্র দ্বারা বোধিত এবং নিশ্চিত রূপে স্বীকৃত তাকে সিদ্ধান্ত বলা হয়। মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্তকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা – সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত এবং অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত।

অবয়বঃ

মহর্ষি উল্লিখিত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত সপ্তম পদার্থ হল **অবয়ব**। বিচারস্থলে বাদী ও প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনে যখন মধ্যস্থ ব্যক্তির বিবদমান পদার্থ-বিষয়ে সংশয় উপস্থাপিত হয় তখন একপক্ষ স্থাপনের উদ্দেশ্যে পঞ্চ-অবয়ব প্রযুক্ত ন্যায়-প্রয়োগ করা হয়; তথা নিজ মতের সাধক প্রমাণ প্রযুক্ত বাক্যসমূহ প্রয়োগ করা হয়। পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের অন্তর্গত এই বাক্যসমূহকে অবয়ব বলা হয়। মহর্ষি গৌতম অবয়ব পদার্থের নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, 'প্রতিজ্ঞাহেতূদাহরণোপনয়নিগমনান্যবয়বাঃ'[১৬]। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন – এই পাঁচটি হল পঞ্চাবয়বী নায়ের পাঁচটি অবয়ব।

তর্কঃ

[১৫] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৬৯।

[১৬] ঐ, পৃষ্ঠা- ২৮৭।

মহর্ষি-সম্মত ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে অষ্টম পদার্থ হল **তর্ক**। মহর্ষি গৌতম তর্কের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'অবিজ্ঞাত-তত্ত্বেঽর্থে কারণোপপত্তিতস্তত্ত্বজ্ঞানার্থমূহস্তর্কঃ'[১৭]। অর্থাৎ যে পদার্থ সামান্যতঃ জ্ঞাত কিন্তু তার তত্ত্ব অবিজ্ঞাত; এমন পদার্থ-বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত কারণের(প্রমাণের) উপপত্তি(সম্ভব) প্রযুক্ত 'ঊহ'(জ্ঞান বিশেষ) হল তর্ক। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক – আত্মা বিষয়ে সামান্যতঃ জানলেও আত্মাকে তত্ত্বতঃ জানব এমন জিজ্ঞাসা জন্মালে আত্মা নিত্য না অনিত্য? এরূপ সংশয় জন্মায়। এরূপ সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত তর্ক প্রযুক্ত হয়। অভিপ্রায় এই যে, আত্মা যদি অনিত্য হয় অর্থাৎ উৎপত্তি-বিনাশশীল হয় তা হলে তার সংসার-অপবর্গ ইত্যাদি সম্ভব হবে না। কারণ ন্যায়মতে জীবাত্মার পূর্বার্জিত শুভাশুভ কর্মের ফল অনুযায়ী নতুন দেহের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয় এবং সুখ দুঃখ ভোগ করে, অর্থাৎ সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়। আবার দ্বাদশ প্রমেয়াদির তত্ত্বজ্ঞান জন্য মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হলে, মিথ্যাজ্ঞান জন্য দোষের নিবৃত্তি হয়, দোষ বিনাশপ্রাপ্ত হলে দোষজন্য প্রবৃত্তি, প্রবৃত্তি জন্য জন্ম, জন্ম জন্য দুঃখাদির বিনাশ ঘটে। এভাবে জীব দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি স্বরূপ অপবর্গ লাভ করে। কিন্তু আত্মা যদি উৎপত্তিধর্মক হয় তা হলে উৎপত্তিকালে নতুন আত্মারই উৎপত্তি হবে, পূর্বে তার সত্তা না থাকায় তার স্বকৃত কর্মজন্য যে দেহাদিধারণ তথা সংসারদশা প্রাপ্তি তা সম্ভব হবে না। আর সংসারের দুঃখ-কষ্টাদি না থাকলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিরূপ মোক্ষেরও সম্ভাবনা নেই। এরূপ তর্কের দ্বারাই আত্মার নিত্যত্ব বিষয়ে সংশয়ের নিবৃত্তি ঘটে।

নির্ণয়ঃ

ন্যায়সম্মত নবম পদার্থ হল **নির্ণয়**। মহর্ষি গৌতম নির্ণয়ের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'বিমৃশ্য পক্ষপ্রতিপক্ষাভ্যামর্থাবধারণং নির্ণয়ঃ'[১৮] অর্থাৎ বিমৃশ্য তথা সংশয়ের পর পক্ষ তথা বাদী এবং বিপক্ষ তথা প্রতিবাদীর নিজপক্ষ স্থাপন এবং পরপক্ষ-খণ্ডনের দ্বারা পদার্থের যে অবধারণ তাকে নির্ণয় বলে।

---

[১৭] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৪৪।

[১৮] ঐ, পৃষ্ঠা – ৩৫৮।

বাদ-জল্প-বিতণ্ডাঃ

ন্যায়মতে বিচার তিনপ্রকারের হতে পারে – বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। এই তিনটিকে একত্রে 'কথা' বলা হয়েছে। এদের মধ্যে তত্ত্বনির্ণয়ের উদ্দেশ্যে যে কথা তা হল **বাদ**। অপরদিকে জয়লাভের উদ্দেশ্যে যখন বাদী ও প্রতিবাদী বিচারে প্রবৃত্ত হন তখন তাঁদের যে কথোপকথন তা **জল্প** নামে পরিচিত। আর যে জল্প প্রতিপক্ষ স্থাপনাহীন হয় অর্থাৎ নিজ পক্ষ স্থাপন না করে কেবল অপর মত খণ্ডনের নিমিত্ত প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, তা **বিতণ্ডা** নামে পরিচিত।

হেত্বাভাসঃ

মহর্ষি গৌতমসম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত ত্রয়োদশ পদার্থ হল **হেত্বাভাস**। 'হেতুবদাভাসন্তে' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে দুষ্ট হেতুকেই হেত্বাভাস বলা হয়েছে। অনুমানস্থলে যা প্রকৃত হেতু নয়, কিন্তু হেতুর ন্যায় প্রতীত হয়, তাকে হেত্বাভাস বলা হয়। আবার 'হেতোরাভাসা দোষা হেত্বাভাসাঃ' এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেতুর দোষকেও হেত্বাভাস বলা হয়ে থাকে। কাজেই 'হেত্বাভাস' শব্দটি দু'টি অর্থে প্রয়োগ হয় – হেতুর দোষ এবং দুষ্ট হেতু। মহর্ষি গৌতম তাঁর *'ন্যায়সূত্র'* গ্রন্থে পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের উল্লেখ করেছেন – 'সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-প্রকরণসম-সাধ্যসম-কালাতীত হেত্বাভাসাঃ'[১৯] অর্থাৎ হেত্বাভাস হল পাঁচপ্রকার, যথা – সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, প্রকরণসম, সাধ্যসম ও কালাতীত। মহর্ষি গৌতম-প্রদত্ত পঞ্চবিধ হেত্বাভাসের মধ্যে প্রথম প্রকারের হেত্বাভাস হল সব্যভিচার।

ছলঃ

মহর্ষি গৌতমসম্মত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের মধ্যে **ছল** হল চতুর্দশ পদার্থ। বিচারস্থলে প্রতিবাদী সদুত্তর প্রদানে অসমর্থ হলে নিরব না থেকে পরাজয় ভয়ে নানা

[১৯] ঐ, পৃষ্ঠা- ৩৯০-৩৯১।

প্রকার অসদুত্তর করতে পারেন। বিচারস্থলে এরূপ অসদুত্তরসমূহকেই ছল বলা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম ছলের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন - 'বচনবিঘাতোঽর্থবিকল্পোপপত্ত্যা ছলং'[২০]

জাতিঃ

ভারতীয়-দর্শনে 'জাতি' শব্দটি নানা অর্থে প্রয়োগ হয়েছে। যেমন, বৌদ্ধদর্শনে জাতি বলতে জন্মকে বোঝানো হয়েছে। আবার বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত জাতি হল সামান্য, যা নিত্য এবং অনেক সমবেত। তবে মহর্ষি গৌতম-স্বীকৃত ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত পঞ্চদশ পদার্থ যে জাতি তা উক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। তিনি 'জাতি' শব্দটিকে পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি জাতির লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সাধর্ম্ম্য-বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং প্রত্যবস্থানং জাতিঃ'[২১] অর্থাৎ বিচারস্থলে বাদী হেতু প্রয়োগ করলে, কোনও প্রকার ব্যাপ্তিকে অপেক্ষা না করে কেবল সাধর্ম্ম্য বা বৈধর্ম্ম্যের দ্বারা প্রতিবাদীর যে প্রত্যবস্থান অর্থাৎ প্রতিষেধ (দোষ উদ্ভাবন) তাকে **জাতি** বলা হয়েছে। মহর্ষি গৌতম তাঁর *'ন্যায়সূত্র'* গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে চব্বিশ প্রকার জাতির উল্লেখ করেছেন।

নিগ্রহস্থানঃ

গৌতমোক্ত মোক্ষোপযোগী ষোড়শ-পদার্থের অন্তর্গত সর্বশেষ পদার্থ হল **নিগ্রহস্থান**। মহর্ষি গৌতম নিগ্রহস্থানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'বিপ্রতিপত্তিরপ্রতিপত্তিশ্চ নিগ্রহস্থানম্'[২২] অর্থাৎ যার দ্বারা বাদী বা প্রতিবাদীর বিপ্রতিপত্তি তথা বিপরীতজ্ঞান এবং অপ্রতিপত্তি তথা অজ্ঞতা প্রকাশ পায়, তাকে নিগ্রহস্থান বলে। মহর্ষি গৌতম *ন্যায়-দর্শনের* পঞ্চম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে নিগ্রহস্থানের মত দ্বাবিংশতি প্রকার প্রদর্শন করেছেন।

ন্যায়-দর্শন তর্কশাস্ত্র বা বিচারশাস্ত্র নামে পরিচিত। তাই বিচারের আবশ্যকতার দিকে লক্ষ্য রেখে ন্যায়-দর্শনের পদার্থতত্ত্ব আবর্তিত হয়েছে। এহেতু ন্যায়-দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি গৌতম বিচারের সহায়করূপে ষোড়শ-পদার্থের সুবিস্তৃত আলোচনা করেছেন। অপরদিকে

---

[২০] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৪৩।

[২১] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৬৪।

[২২] ঐ, পৃষ্ঠা- ৪৬৭।

বৈশেষিক-দর্শন প্রমেয়শাস্ত্র হিসাবে আখ্যায়িত হয়েছে। কারণ যা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞেয় তথা প্রমেয় সে সমস্তই সুবিস্তৃতভাবে বৈশেষিক-দর্শনে আলোচিত হয়েছে। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, ন্যায়-বৈশেষিক সমানতন্ত্র দর্শন হলেও উভয়ের পদার্থতত্ত্বের বৈলক্ষণ্যই দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু আমরা যদি ন্যায়-বৈশেষিক চর্চার ধারার প্রতি একটু গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তা হলে এটা পরিষ্কার যে, উভয় পদার্থতত্ত্ব পরস্পর বিরোধী নয়। ন্যায়-দর্শন অনিয়ত-পদার্থবাদী। তাই এঁরা পদার্থের কোনও নির্দিষ্ট সংখ্যা নিয়ম মানেন না। এঁদের মতে পদার্থ অসংখ্য। তবে যেগুলি ন্যায়-দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য যে নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তি; তার উপযোগী কেবল সেই সমস্ত পদার্থই মহর্ষি গৌতম-কর্তৃক উদ্দিষ্ট হয়েছে। তাই মহর্ষি গৌতম মোক্ষোপযোগীরূপে ষোড়শ-পদার্থের উদ্দেশ করেছেন। যদিও বৈশেষিক-সম্মত দ্রব্যাদি পদার্থও ন্যায়সম্মত। বৈশেষিকমতে পদার্থ সাত প্রকার, তার অধিকও নয় অল্পও নয়। তবে এ জগতে যা কিছু রয়েছে তা সমস্তই উক্ত সপ্ত-শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত, তার বাইরে কিছু নেই। কাজেই ন্যায়সম্মত ষোড়শ-পদার্থ বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত।

বৈশেষিক পদার্থতত্ত্বঃ

বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ তাঁর '*বৈশেষিকসূত্র*-এর প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে বলেন, 'ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্ দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্'[২৩]। অভিপ্রায় এই যে, জাগতিক জ্ঞেয় বস্তু অনন্ত সংখ্যক হলেও সেগুলিকে ছয়টি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়। পদার্থধর্মসংগ্রহকার প্রশস্তপাদও সূত্রকারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে পদার্থের বিভাগ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'দ্রব্যগুণকর্মসামান্যবিশেষসমবায়ানাং ষণ্ণাং পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানং নিঃশ্রেয়সহেতুঃ'[২৪] অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়

[২৩] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা - ১৬।

[২৪] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০, পৃষ্ঠা-৩৯।

– এই ছয় প্রকার পদার্থের সাধর্ম্য বৈধর্ম্যের যে তত্ত্বজ্ঞান তা মুক্তির কারণ। তবে অনেক টীকাকার মনে করেন প্রশস্তপাদাচার্য নিঃশ্রেয়সের ক্ষেত্রে অভাব-পদার্থের উপযোগীতার কথা উপদেশ না করলেও, অভাব-পদার্থ যে তিনিও স্বীকার করতেন তা 'পদার্থানাং সাধর্ম্যবৈধর্ম্যতত্ত্বজ্ঞানাং' এই অংশ হতে পরিস্কৃত। অভিপ্রায় এই যে, প্রশস্তপাদাচার্য *ভাষ্যে* ছয় প্রকার পদার্থের উদ্দেশ করলেও অভাব-পদার্থ তাঁর সম্মত। কারণ বৈধর্ম্য মানে অসাধারণ ধর্ম অর্থাৎ যা সাধারণ ধর্ম হতে ভিন্ন তা হল বৈধর্ম্য। আর ভিন্নতা বা ভেদ অভাবেরই নামান্তর। কাজেই প্রশস্তপাদাচার্যের মতেও পদার্থ সাত প্রকার, যথা – দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। এখন বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের স্বরূপ আলোচনা করা হচ্ছে –

দ্রব্যঃ

বৈশেষিক-সম্মত সপ্ত-পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ হল **দ্রব্য**। দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে মহর্ষি কণাদ বলেছেন – 'ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্'[২৫]। এখানে দ্রব্যের তিনটি লক্ষণের কথা বলা হয়েছে। যা ক্রিয়াবৎ অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয় হয় তা হল দ্রব্য, কিন্তু এটি দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ নয়। কারণ আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা – এই চারটি দ্রব্য বিভু হওয়ায় নিষ্ক্রিয়। তাই দ্রব্যের দ্বিতীয় লক্ষণটি বলা হয়েছে - "গুণবত্ত্ব" অর্থাৎ যা গুণের আশ্রয় হয় তা হল দ্রব্য। কিন্তু এটিও দ্রব্যের নির্দোষ লক্ষণ হতে পারে না। কারণ উৎপত্তিকালীন দ্রব্য গুণের আশ্রয় হয় না, তা গুণহীন হয়ে থাকে। এই অব্যাপ্তি দোষ পরিহারের জন্য আচার্যগণ বলেন প্রদত্ত স্থলে 'গুণবত্ত্ব' শব্দটিকে একটি বিশেষ অর্থে গ্রহণ করতে হবে। মাধব সরস্বতী তাঁর '*মিতভাষিণী* টীকাতে বলেছেন –'যদ্বা গুণাত্যন্তাভাববিরোধিমত্ত্বং গুণবত্ত্বং বিবক্ষিতম্'[২৬] অর্থাৎ যা গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণ হয় তা দ্রব্য, কারণ দ্রব্যে গুণের অত্যন্তাভাব থাকে না। দ্রব্য হল গুণের আশ্রয়।

---

[২৫] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ৪৬।

[২৬] ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৫৯।

উৎপত্তিকালীন দ্রব্য উৎপত্তিক্ষণে নির্গুণ হলেও দ্বিতীয়-তৃতীয় ক্ষণে তাতে গুণ বিদ্যমান থাকে। তাই তা গুণের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয় না। অত্যন্তাভাব হল ত্রৈকালিক অভাব, কাজেই 'গুণবত্ত্ব' এর অর্থ করতে হবে – গুণের অত্যন্তাভাবের অনধিকরণত্ব তথা প্রতিযোগিব্যধিকরণ গুণাভাবশূন্যত্ব। গুণাভাবের প্রতিযোগী হল গুণ। যেখানে গুণাভাব থাকে সেখানে যদি পরবর্তিকালে গুণ থাকে তা হলে গুণাভাব ও তার প্রতিযোগী গুণ সমানাধিকরণ হয়, প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না। যেখানে গুণাভাব থাকে সেখানে যদি গুণ কখনও থাকে তা হলে সেই গুণাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয়। উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে গুণাভাব থাকলেও সেই গুণাভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণ হয় না। কারণ ঐ দ্রব্যে দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয়। তা হলে উৎপত্তিকালীন দ্রব্যে দ্রব্য লক্ষণের অব্যপ্তির আশঙ্কা থাকবে না। কিন্তু তা হলেও আপত্তি থেকেই যায় – যে ক্ষণে দ্রব্য উৎপন্ন হয় তার পরক্ষণেই যদি সেই দ্রব্যটি বিনষ্ট হয়ে যায় তা হলে সেই দ্রব্যটিও কোনও কালেই গুণের আশ্রয় হতে পারে না। এমন দ্রব্য গুণের অত্যন্তাভাবের অধিকরণ হয়ে যাচ্ছে, অনধিকরণ হচ্ছে না। ফলস্বরূপ এমন উৎপন্ন-বিনষ্ট দ্রব্যে উক্ত দ্রব্য লক্ষণের অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এই জন্য দ্রব্যের তৃতীয় লক্ষণ বলা হয়েছে – 'সমবায়িকারণং দ্রব্যম্' অর্থাৎ 'সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকধর্মবত্ত্বম্ দ্রব্যত্বম্'। দ্রব্য যেহেতু সমবায়িকারণ হয় সেহেতু সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হবে দ্রব্যত্ব। আর এই দ্রব্যত্বের আশ্রয় হল দ্রব্য। শিবাদিত্য দ্রব্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দ্রব্যং তু দ্রব্যত্বসামান্যযোগি গুণবৎ সমবায়িকারণং চেতি'[২৭]।

বৈশেষিক-সূত্রকার মহর্ষি কণাদ দ্রব্যের বিভাগ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি''[২৮] অর্থাৎ বৈশেষিকমতে দ্রব্য নয় প্রকার, যথা – পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। এই নয় প্রকার

[২৭] ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০, পৃষ্ঠা – ৫৮।

[২৮] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা – ২৮।

দ্রব্যের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন হল নিত্য দ্রব্য; কারণ এদের উৎপত্তি নেই বিনাশও নেই। বৈশেষিকমতে পৃথ্বীব্যাদি আদির পরমাণুও নিত্য, তবে পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর দ্ব্যণুক আদি থেকে শুরু করে স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্থূল তেজ, স্থূল বায়ু অনিত্য। বৈশেষিক-দর্শনে পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ এই পাঁচটিকে ভূতদ্রব্য বলা হয়েছে। তবে এদের মধ্যে আকাশ ব্যতীত পৃথ্বীব্যাদি ও মন হল মূর্ত দ্রব্য। অপরদিকে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা হল বিভু দ্রব্য। মন মূর্ত দ্রব্য হলেও তা মহৎ পরিমাণ-বিশিষ্ট নয়, বৈশেষিকমতে মন অণুত্বপরিমাণবিশিষ্ট।

গুণঃ

মহর্ষি কণাদ গুণের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন – 'দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ ইতি গুণলক্ষণম্'[২৯] অর্থাৎ যা দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান্ এবং সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ হয়, তাকে **গুণ** বলে। অভিপ্রায় এই যে, গুণ দ্রব্যে আশ্রিত তাই গুণে দ্রব্যাশ্রয়িত্ব আছে। কিন্তু এই দ্রব্যাশ্রয়িত্ব সাবয়ব দ্রব্যেও থাকে। কারণ সাবয়ব দ্রব্য তার অবয়বে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। তাই গুণ লক্ষণে অগুণবান পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। সাবয়ব দ্রব্যে দ্রব্যাশ্রয়িত্ব থাকলেও তা গুণবান হয়, অগুণবান হয় না। কিন্তু গুণ সর্বদা অগুণবান হয়ে থাকে। কারণ গুণে গুণ থাকতে পারে না, সেক্ষেত্রে অনবস্থা দোষ হয়। কিন্তু কর্ম তো দ্রব্যাশ্রিত এবং গুণহীন হয়। তাই গুণের লক্ষণ বলা হয়েছে যা দ্রব্যাশ্রিত, অগুণবান এবং সংযোগ-বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ নয়। কর্ম দ্রব্যাশ্রিত এবং অগুণবান হলেও তা সংযোগ-বিভাগের প্রতি অনপেক্ষ কারণ হয়। কিন্তু গুণ অনপেক্ষভাবে সংযোগ-বিভাগের কারণ হতে পারে না, বেগ আদি গুণ কর্মকে অপেক্ষা করেই সংযোগ-বিভাগের কারণ হয়ে থাকে। কাজেই যা দ্রব্যাশ্রিত, গুণহীন এবং সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয় তাকেই বৈশেষিক-দর্শনে গুণ বলা হয়েছে। মহর্ষি কণাদ *বৈশেষিক সূত্রের* প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ষষ্ঠ সূত্রে সতেরটি গুণের উল্লেখ করেছেন, যথা- রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ,

[২৯] ঐ, পৃষ্ঠা – ৪৮।

ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন। যদিও প্রশস্তপাদাচার্য গুরুত্ব, দ্রব্যত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্ম ও শব্দ এই সতেরটি গুণও স্বীকার করেছিলেন। কাজেই বৈশেষিকমতে চব্বিশ প্রকার গুণ স্বীকৃত।

কর্মঃ

মহর্ষি কণাদ কর্মের লক্ষণ প্রদান করেছেন এভাবে – 'একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষকারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্'[৩০] অর্থাৎ যা একৈক তথা যা এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না, নির্গুণ এবং সংযোগ-বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ হয় তা হল **কর্ম**। 'যা এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না তাকে কর্ম বলে' কেবল এইটুকুকে যদি দ্রব্যের লক্ষণ বলা হয় তাহলে আকাশাদি নিত্য দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি হবে। কারণ আকাশাদি নিত্যদ্রব্য কোথাও বৃত্তি হয় না। তাই এককালে একাধিক দ্রব্যে বৃত্তি এমনও বলা যায় না। এই হেতু কর্মের লক্ষণে 'নির্গুণ' পদটি সন্নিবেশিত হয়েছে। আকাশাদি এককালে একাধিক পদার্থে বৃত্তি না হলেও তা নির্গুণ নয়। আমরা জানি শব্দ হল আকাশের গুণ। কিন্তু উক্ত লক্ষণও যথাযথ হতে পারেনি; কারণ রূপ, রসাদি গুণও এককালে একাধিক দ্রব্যে থাকে না, তা গুণস্বরূপ হওয়ায় নির্গুণ। কাজেই লক্ষণ লক্ষ্যের অধিকদেশবৃত্তি হয়ে পড়ছে। তাই কর্মের লক্ষণ বলা হয়েছে, যা একৈক দ্রব্যমাত্রবৃত্তি, নির্গুণ এবং সংযোগ ও বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয়; তাকেই কর্ম বলা হয়েছে। রূপ, রসাদি সংযোগাদির কারণ না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা নেই। তবে লক্ষণে যদি 'অনপেক্ষ' পদটি সন্নিবেশিত না হত তাহলে অদৃষ্টে অতিব্যাপ্তি হত। কারণ অদৃষ্ট সকল জন্য বস্তুরই কারণ হয়, কাজেই তা সংযোগ ও বিভাগেরও কারণ হয়ে থাকে। তবে তা সংযোগ-বিভাগের অনপেক্ষ কারণ হয় না; অদৃষ্ট স্ব উত্তর কালোৎপন্ন কর্মাদিকে অপেক্ষা করেই সংযোগাদির কারণ হয়ে থাকে। কাজেই যা একৈক, নির্গুণ এবং সংযোগ বিভাগের অনপেক্ষ কারণ তাকেই বৈশেষিক-

[৩০] ঐ, পৃষ্ঠা – ৫২।

দর্শনে কর্ম নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহর্ষি কণাদ মতে কর্ম পাঁচপ্রকার, যথা- উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন।

সামান্যঃ 'সমানানাং ভাবঃ' এরূপ অর্থে সমান শব্দের উত্তর 'ষ্যঞ্' প্রত্যয় যোগে সামান্য শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে, যার অর্থ হল সাধারণ ধর্ম। কিন্তু বৈশেষিক-দর্শনে সামান্য শব্দটি সাধারণ ধর্ম অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। সামান্যের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- 'নিত্যম্ একম্ অনেকানুগতং সামান্যম্' অর্থাৎ যা নিত্য তথা উৎপত্তি বিনাশ রহিত, এক এবং অনেকানুগত তথা অনেক অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে বৃত্তি হয় তাকে **সামান্য** বলা হয়। ঘটত্ব, পটত্ব, মনুষত্ব প্রভৃতি ধর্মগুলি উৎপত্তি বিনাশ রহিত, এক এবং যথাক্রমে অনেক ঘটে, অনেক পটে, অনেক মানুষে সমবায়-সম্বন্ধে থাকে। তাই এগুলি হল সামান্য। প্রশস্তপাদাচার্যের মতে এই সামান্য বা জাতি দু'প্রকার – পর সামান্য এবং অপর সামান্য। সত্তা হল পর সামান্য কারণ তার আশ্রয় বহু পদার্থ, অপরদিকে ঘটত্বাদি হল অপর সামান্য যেহেতু তা সত্তার অপেক্ষা স্বল্প আশ্রয়ে থাকে।

বিশেষঃ 'বি' উপসর্গ পূর্বক শিষ্ন ব্যাপ্তৌ এরূপ ব্যাপ্তি অর্থে 'শিষ' ধাতুর উত্তর বিশিনষ্টি অর্থাৎ বিশেষিত করে এরূপ অর্থে কতৃবাচ্যে 'ঘঞ' প্রত্যয় করে বিশেষ শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈশেষিকশাস্ত্রে বিশেষ শব্দটির এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিশেষ পদার্থটিকে গ্রহণ করা হয় না। কারণ এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিশেষ পদের অর্থ হয় ব্যাবর্তকত্ব, কিন্তু সেই ব্যাবর্তকত্ব যে অনুগতাকার জ্ঞানের হেতু হয় না, তা বোঝা যায় না। অভিপ্রায় এই যে, গোত্বাদি জাতিগুলিও ব্যাবর্তক হয়। কারণ গোত্ব জাতি সকল গো কে অশ্ব প্রভৃতি হতে ব্যাবৃত্ত করে। কাজেই গোত্বাদি জাতিও ব্যাবর্তক হতে পারে। কিন্তু তারা অনুগতাকার প্রতীতিরও জনক হয়। যেহেতু তা সকল গো তে অনুগত। কিন্তু বৈশেষিক-সম্মত পঞ্চম পদার্থ বিশেষ এমন নয়, তা কেবল ব্যাবর্তক হয়; কোনওরূপ অনুগত প্রতীতির হেতু হয় না। শুধু তাই নয় বিশেষ রূপ পদার্থটি যেমন নিত্য পদার্থগুলিকে একে অন্যের হতে পৃথক করে তদনুরূপ এক বিশেষ হতে অন্য বিশেষকেও ব্যাবৃত্ত করে অর্থাৎ তা স্বতঃ ব্যাবর্তক হয়ে থাকে। তাই প্রশস্তপাদাচার্য বিশেষ পদার্থের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন –

'নিত্যদ্রব্যবৃত্তয়োঽন্ত্যাঃ বিশেষাঃ'[৩১]। অর্থাৎ যা নিত্য দ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে বিদ্যমান থেকে নিত্যদ্রব্যসমূহের ভেদ সাধন করে এবং নিজেকেও অন্য বিশেষ হতে ব্যাবৃত্ত করে তা হল বৈশেষিক-সম্মত **বিশেষ** নামক পদার্থ।

সমবায়ঃ বৈশেষিক-সম্মত ষষ্ঠ পদার্থ হল **সমবায়**। মহর্ষি কণাদ সমবায়ের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন- 'ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ'[৩২]। অর্থাৎ কার্য ও কারণের মধ্যে 'এই আধারে এই আধেয় আছে' এরূপ জ্ঞান যে সম্বন্ধ জন্য হয়, তা হল সমবায়। যদিও শঙ্কর মিশ্র তাঁর উপস্কার টীকাতে বলেছেন মহর্ষি প্রদত্ত লক্ষণে 'কার্যকারণয়োঃ' এই শব্দের দ্বারা কার্য ও কারণ এবং অকার্য ও অকারণকেও বোঝানো হয়েছে। প্রদত্ত স্থলে 'কার্যকারণয়োঃ' পদটি উপলক্ষণ। ফলত তা কার্য ও কারণকে বুঝিয়ে তদতিরিক্ত অকার্য ও অকারণকেও বোঝায়। তা না হলে অনিত্য দ্রব্য-অনিত্য গুণ, দ্রব্য-গুণ, দ্রব্য-কর্ম, অবয়ব-অবয়বী এদের মধ্যে কার্য-কারণভাব থাকলেও দ্রব্য-জাতি, গুণ-জাতি, কর্ম-জাতি, নিত্য দ্রব্য-নিত্য গুণ, নিত্য দ্রব্য- বিশেষ এই সকল পদার্থ যুগলের মধ্যে কার্য-কারণভাব নেই। কিন্তু এদের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ আছে। মূল কথা হল দু'টি অযুতসিদ্ধ অর্থাৎ দু'টি পদার্থ যদি এমন হয় তাঁরা একটি অন্যটিকে ছেড়ে থাকতে পারে না; এমন দু'টি পদার্থের মধ্যেকার সম্বন্ধ হল সমবায়। যেমন অবয়ব ও অবয়বী ; অবয়বী কখনো অবয়বকে ছেড়ে থাকতে পারে না। তাই এই দু'য়ের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ স্বীকৃত। বৈশেষিকমতে এই সমবায় সম্বন্ধটি এক এবং এটি একটি নিত্য সম্বন্ধ।

অভাবঃ বৈশেষিক স্বীকৃত সপ্তম এবং সর্বশেষ পদার্থ হল **অভাব**। বৈশেষিকমতে ভাবভিন্ন পদার্থ হল অভাব। *সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে* অভাবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে – 'অভাবত্বং দ্রব্যাদিষট্কান্যোন্যাভাববত্ত্বম্'[৩৩]। অভিপ্রায় এই যে, দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব-পদার্থের ভেদ যাতে

---

[৩১] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, প্রথম ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৩০।

[৩২] ভট্টাচার্য্য, তর্করত্ন (অনুদিত), মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্ *বৈশেষিক-দর্শনম্*, কলিকাতা, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী, ১৩১৩, পৃষ্ঠা- ৩৯৫।

[৩৩] শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত), *ভাষা-পরিচ্ছেদঃ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, পুনর্মুদ্রণ, ১৪২৩ ,পৃষ্ঠা- ৭৮।

রয়েছে তা হল অভাব নামক পদার্থ। এই অভাব নামক পদার্থটি 'নঞ' আদি নিষেধমূলক পদ জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়। কোনও কিছুর থাকা যেমন আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয় তেমনই কোনও কিছুর না থাকাও আমাদের জ্ঞানের বিষয় হয়। যেমন, টেবিলে ঘট নেই এস্থলে টেবিলরূপ অধিকরণে ঘটের না থাকার জ্ঞান আমাদের হয়ে থাকে। এই জ্ঞানের বিষয়রূপে অভাব নামক পদার্থ বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। বৈশেষিকমতে অভাব দ্বিবিধ – সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। যে অভাব তার প্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হয় তাকে সংসর্গাভাব বলে। যেমন- বায়ুতে রূপের অভাব। আর যে অভাবের প্রতিযোগিতাটি তাদাত্ম্য সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সেই অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলে। যেমন- ঘটে পটের অভাব। বৈশেষিকমতে এই সংসর্গাভাব আবার প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব ভেদে ত্রিবিধ।

রঘুনাথ শিরোমণিকৃত পদার্থতত্ত্বঃ

বৈশেষিক-দর্শনের আলোকে পদার্থতত্ত্বের আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না যদি না আমরা রঘুনাথ শিরোমণির মত আলোচনা করি। কারণ তিনি স্বাধীন চিন্তার দ্বারা মহর্ষি কণাদ বর্ণিত পদার্থতত্ত্বের নতুন আঙ্গিকে পর্যালোচনা করেছিলেন। মহর্ষি প্রদত্ত পদার্থসমূহের কতিপয় তিনি নিঃসঙ্কোচে খণ্ডন করেছেন। আবার মীমাংসকাদি সম্প্রদায়ের ন্যায় যে সমস্ত পদার্থের স্বীকৃতি আবশ্যক মনে করেছেন তাদের উপযুক্ত যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, বৈশেষিক-দর্শনের দ্রষ্টা মহর্ষি কণাদ আমাদের পরিদৃশ্যমান জগৎএর যাবতীয় জাগতিক বিষয় সমূহকে মূল সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করেছিলেন। মহর্ষি-সম্মত সেই সপ্ত পদার্থ হল- দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি কণাদ সম্মত বিশেষ নামক পদার্থটিকে স্বীকারই করেন না। এখানে উল্লেখ্য যে কথিত আছে, বিশেষ নামক পদার্থটিকে স্বীকার করার জন্যই এই সম্প্রদায়ের নাম বৈশেষিক হয়েছে। যদিও এবিষয়ে মতপার্থক্য বিদ্যমান, তথাপি এই প্রসঙ্গে আমার এই কথাটি বলার মূল উদ্দেশ্য হল বৈশেষিকাচার্যগণ কর্তৃক যে পদার্থ স্বীকৃত, সেই পদার্থই রঘুনাথ কর্তৃক খণ্ডিত হয়েছে। শুধু তাই নয় বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত দ্রব্যাদি পদার্থ তিনি স্বীকার করলেও

পৃথিব্যাদি নয় প্রকার দ্রব্যের মধ্যে আকাশ, কাল, দিক্ নামক যে বিভু দ্রব্য বৈশেষিক-দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে তা রঘুনাথ কর্তৃক সমালোচিত হয়েছে। তিনি আকাশাদিকে পৃথক দ্রব্য হিসাবে স্বীকারই করেন না; সেগুলিকে ঈশ্বরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ ছাড়াও তিনি মহর্ষি কণাদ সম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ অতিরিক্ত ঘটত্যন্তাভাবাভাব, বিষয়ত্ব, প্রতিযোগীত্ব, অধিকরণত্ব, শক্তি, স্বত্ব, সাদৃশ্য, সংখ্যা প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র পদার্থান্তরের মর্যাদা দিয়েছেন। দ্ব্যণুক-পরমাণু, অবয়ব-অবয়বী, ঈশ্বরগত পরিমাণ প্রভৃতি বিষয়েও প্রচলিত বৈশেষিক মত থেকে বেরিয়ে নতুন আঙ্গিকে পদার্থতত্ত্বের রূপায়ণে প্রয়াসী ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

বৈশেষিক-দর্শনে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়

নানা বৈচিত্র্যে ভরা আমাদের এই জগতের সৃষ্টি রহস্য সত্যই বিস্ময়কর। আমরা যদি মানব সভ্যতার আদিম পর্বে ফিরে তাকাই তা হলে দেখতে পাব একটা সময় ছিল যখন মানুষের না ছিল খাদ্যের নিশ্চয়তা; না ছিল বাসস্থানের নিশ্চয়তা, তাঁরা অরণ্যে বিচরণ করতেন। জীবনরক্ষার তাগিদে তাঁদের প্রতিনিয়ত সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হত। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম ও বুদ্ধি শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যখন তাঁরা জীবন সংগ্রামে জয় লাভ করতে শিখে গেলেন তখনই তাঁদের শুরু হল নিজের বুদ্ধিশক্তির সঙ্গে লড়াই। সে কে? কোথা হতে এল? এই বৈচিত্রে ভরা জগতের সৃষ্টি হল কীভাবে? কে সৃষ্টি করলেন এই বৈচিত্র্যময় নানাত্বের জগৎ কে? এই জগৎ এর শেষ কোথায়? মহাপ্রলয় বলে কি কিছু আছে? এমন হাজার প্রশ্নের সম্মুখে মানুষ নিজেকে দাঁড় করিয়েছে এবং নিজ নিজ বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা তার উত্তর আনুসন্ধনে ব্যাপৃত থেকেছে।

বৈশেষিকমতে আমাদের পরিদৃশ্যমান এই জগৎ-সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটি অবস্থার মধ্য দিয়েই বিবর্তিত হয়। আজকে আমাদের এই জগৎ বিদ্যমান; তার সৃষ্টির পূর্বে তৎপূর্বতন সৃষ্টির প্রলয় হয়েছিল। প্রলয়ের পর সৃষ্টি আবার প্রলয় তারপর সৃষ্টি এভাবে নিরন্তর ধারা বয়ে চলেছে। তাই বৈশেষিকাচার্যগণ জগৎকে অনাদি বলেছেন। কারণ তাঁদের মতে বর্তমানে আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি তার আদি নির্ণয় করা আমাদের মত সসীম জীবের পক্ষে সম্ভবই নয়। তবে তা অনন্ত নয়। তাঁদের মতে সকল জীবের সকল কর্মের ফলভোগের যুগপৎ পরিসমাপ্তি যেদিন ঘটবে, সেদিন আসবে মহাপ্রলয়। প্রশস্তপাদাচার্য, আচার্য উদয়ন প্রমুখ হলেন এই মতের সমর্থক। যদিও কোনও কোনও আচার্য, যেমন – মীমাংসক কুমারিলভট্ট মনে করেন সকল জীবের সকল কর্মের ফলভোগ এর যুগপৎ পরিসমাপ্তি কখনওই সম্ভব নয়। কারণ জীব অনন্ত, তাই তার কর্মও অনন্ত। তাই সকল জীবের সকল কর্মের যুগপৎ বিনাশ কখনওই সম্ভব নয়। কাজেই মহাপ্রলয়ের

কল্পনা অর্থহীন। যদিও বৈশেষিক-আচার্যগণ মনে করেন আমাদের এই জগৎ-সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছে। 'ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ' অর্থাৎ পরমেশ্বর পূর্বের সৃষ্টির ন্যায় এই সৃষ্টির রচনা করেছেন - এই শ্রুতি বাক্যই সে বিষয়ে প্রমাণ। বর্তমান অধ্যায়ে আমি মূলত জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অবস্থাতে পদার্থের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করব। অভিপ্রায় এই যে, পদার্থের কীরূপ তারতম্যের ফলে জগৎ-সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় এই তিনটি অবস্থা প্রাপ্ত হয় তা অনুসন্ধান করা আমার এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের আলোচনায় বৈশেষিক-সম্মত পদার্থসমূহের প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করতে হলে সর্বাগ্রে বৈশেষিক-সম্মত সৃষ্টি ও প্রলয় ক্রমটির আলোচনা করা আবশ্যক। তাই এখন বৈশেষিকাচার্যগণ-বর্ণিত জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রমটি আলোচনা করা হচ্ছে - বৈশেষিকাচার্যগণ সৃষ্টিমাত্রকে প্রলয়পূর্বক বলেছেন। তাঁদের মতে বর্তমানে যে সৃষ্টি রয়েছে তার পূর্বে পূর্বতন সৃষ্টির প্রলয় হয়েছিল। আবার সেই প্রলয়ের যে পূর্বতন সৃষ্টি তার পূর্বে আরেক প্রলয় ছিল। কাজেই সৃষ্টির ধারণাটিকে বুঝতে গেলে প্রথমে প্রলয়ের ধারণাটি বিষয়ে অবগত হতে হবে। বৈশেষিকাচার্য প্রশস্তপাদ তাই তাঁর *'পদার্থধর্মসংগ্রহ'* গ্রন্থের সৃষ্টি-সংহার প্রকরণে বলেছেন - 'ব্রাহ্মেণ মানেন বর্ষশতান্তে বর্তমানস্য ব্রহ্মণোঽপবর্গকালে সংসারখিন্নানাং সর্বপ্রাণিনাং নিশি বিশ্রামার্থং...পূর্বস্য পূর্বস্য বিনাশঃ ততঃ প্রবিভক্তাঃ পরমাণবোহবতিষ্ঠন্তে ধর্মাধর্মসংস্কারানুবিদ্ধা আত্মানস্তাবন্তমেব কালম্'[৩৪]। অভিপ্রায় এই যে, মানুষ, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব সারাদিনের ক্লান্তি থেকে কিছু সময়ের জন্য নিষ্কৃতির নিমিত্ত রাত্রিকালে বিশ্রামের প্রয়োজন অনুভব করে। ঠিক তেমনই জীব পূর্বজন্মে কৃত-কর্মের ফলভোগের নিমিত্ত জন্ম তারপর মৃত্যু আবার জন্ম এভাবে জন্মমৃত্যুর শৃঙ্খলে বারংবার আবর্তিত হতে হতে একটা সময় অসহায় বোধ করে এবং তা থেকে আপাত নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ব্রহ্মার আয়ুর পরিমাণে একশত বৎসর শেষে

[৩৪] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

যখন তাঁর বিদেহ মুক্তিলাভের সময় উপস্থিত হয় এবং দীর্ঘ জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত জীব কিছুকাল সংসার চক্র থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। তখন মহেশ্বর (পরমেশ্বর) জীবকুলকে কিছুকালের জন্য বিশ্রাম দেওয়ার জন্য সমস্ত জগতের তথা অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল – এই সপ্ত অধঃলোক এবং ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, অপঃ ও সত্য – এই সপ্ত ঊর্ধ্বলোকের সংহারের ইচ্ছা করেন। পরমেশ্বরের সংহারেচ্ছা উপস্থিত হলে মহাপ্রলয়ের কারণীভূত অদৃষ্টের দ্বারা শরীর, ইন্দ্রিয়, মহাভূতের উৎপাদক অদৃষ্ট সকলের বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। ফলস্বরূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, পৃথীব্যাদি চতুর্বিধ মহাভূতের প্রত্যেক কার্যদ্রব্যের পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। দ্ব্যণুকের উৎপাদক পরমাণুতে উক্ত ক্রিয়ার ফলে পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ উৎপন্ন হয়। ফলত পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে অসমবায়ি কারণের নাশে প্রথম উৎপন্ন কার্য দ্রব্য দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়। দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুক বিনষ্ট হয়। ত্র্যণুক (ত্রসরেণু) বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত চতুরণুকের বিনাশ ঘটে। এভাবে ক্রমে ক্রমে পৃথিব্যাদি স্থূল কার্যদ্রব্য সমূহ বিনষ্ট হয়। এখানে উল্লেখ্য যে কার্যদ্রব্য বিনাশ প্রক্রিয়া বিষয়ে আচার্যগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কোনও কোনও আচার্যয়গণ মনে করেন কার্যদ্রব্যের নাশ দু'ভাবে হতে পারে। কখনও সমবায়িকারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়; আবার কখনও অসমবায়ি কারণের নাশে কার্যদ্রব্যের নাশ হয়। যেমন, ঘট প্রভৃতি জন্য দ্রব্যের নাশের প্রতি তার সমবায়িকারণ তথা কপালের নাশ কারণ হয়ে থাকে। যেহেতু মুদ্গর প্রভৃতির আঘাতে ঘটের সমবায়িকারণ তথা কপাল বিনষ্ট হলে ঘট বিনষ্ট হতে দেখা যায়। তবে দ্ব্যণুকের নাশে তার সমবায়ি কারণের তথা পরমাণুর নাশকে কারণ বলা যাবে না। যেহেতু দ্ব্যণুকরূপ কার্যের সমবায়িকারণ হয় দু'টি পরমাণু। আর বৈশেষিকমতে পরমাণু নিত্য। তাই তার উৎপত্তি নেই; বিনাশও নেই। এহেতু দ্ব্যণুকের নাশের প্রতি অসমবায়ি কারণের নাশ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশকে কারণ বলতে হবে। যদিও অনেক নব্য নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকাচার্যগণ বলেছেন- দ্ব্যণুকরূপ প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতি অসমবায়ি কারণের নাশ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশকে কারণ আবার ত্র্যণুকাদি হতে শুরু করে যাবৎ

জন্য পদার্থের নাশের প্রতি তাদের স্ব স্ব সমবায়িকারণের নাশকে কারণ না বলে; সকল জন্য দ্রব্যের নাশের প্রতি স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ বলা অধিক সঙ্গত হয়। কারণ কোনও কোনও জন্য দ্রব্যের নাশকে ব্যাখ্যা করতে অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ আবার কোনও কোনও জন্য দ্রব্যের নাশকে ব্যাখ্যা করতে সমবায়ি কারণের নাশকে কারণ বলাতে গৌরব অনিবার্য হয়ে পড়ে। তদপেক্ষা সকল জন্য দ্রব্যের নাশ যেহেতু স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশের দ্বারা ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় সেহেতু সকল জন্য দ্রব্যের নাশের ব্যাখ্যা একটি প্রক্রিয়াতে দিলে লাঘব হয়। দ্ব্যণুকাদি প্রথমোৎপন্ন কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতি যেমন তার অসমবায়িকারণ তথা পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। তদনুরূপ ত্র্যণুক প্রভৃতি কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতিও তার অসমবায়িকারণ তিনটি দ্ব্যণুকের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। এভাবে ঘটাদি স্থূল কার্যদ্রব্যের নাশের প্রতিও তার অসমবায়িকারণ তথা কপালদ্বয়ের সংযোগ নাশ কারণ হয়ে থাকে। তাই অনেক নব্য আচার্য এবং বৈশেষিক সম্প্রদায়ভুক্ত আচার্যগণও জন্য দ্রব্যমাত্র নাশের প্রতি স্ব স্ব অসমবায়ি কারণের নাশকে কারণ মেনেছেন। যাই হোক বৈশেষিকমতে পরমেশ্বরের সংহারেচ্ছায় পরমাণু-সমূহ সক্রিয় হলে তাতে বিভাগ উৎপন্ন হয়। পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে বিভাগ উৎপন্ন হলে তাদের যে পূর্ব সংযোগ তা বিনষ্ট হয়ে যায়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়। দ্ব্যণুকের নাশে ত্র্যণুক, ত্র্যণুকের নাশে চতুরণুক এভাবে ক্রমান্বয়ে স্থূল পৃথিবী, স্থূল জল, স্তুল তেজ, স্থূল বায়ু হতে শুরু করে সমস্ত কার্যদ্রব্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কার্যদ্রব্য বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত রূপাদি গুণসমূহও বিনষ্ট হয়। এভাবে বৈচিত্র্যময় এই জগৎ ও জগৎএর যাবতীয় বস্তুসমূহ বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে পরিশেষে পরমাণুতে পর্যবসিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রলয়কালে সমস্ত কার্যদ্রব্য বিনষ্ট হলেও নিত্য দ্রব্যসমূহ তথা প্রচয় নামক সংযোগ রহিত পরমাণু সকল, আত্মা সকল, দিক্, কাল, আকাশ, মন, ঈশ্বর, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রযত্ন প্রভৃতি বিদ্যমান থাকে। শুধু তাই নয়, ধর্ম-অধর্মরূপ যে অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার নিত্য না হলেও প্রলয়ের পর বিদ্যমান থাকে। কারণ তা না হলে প্রলয়ের পর যে সৃষ্টি হবে সেখানে জীবগণের প্রতিনিয়ত যে ভোগ ব্যবস্থা

তা সিদ্ধ হবে না। অভিপ্রায় এই যে শাস্ত্রে বলা আছে প্রতিটি জীবাত্মার ভোগ নিয়ত। এক আত্মার ভোগ অন্য আত্মাতে প্রযুক্ত হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে। এজন্য প্রতি জীবাত্মার সঙ্গে সম্বদ্ধ ধর্ম-অধর্ম, সংস্কার প্রভৃতির বিদ্যমানতা প্রলয়কালেও অবশ্য স্বীকার করতে হবে। এই প্রসঙ্গে উদয়নাচার্য বলেছেন নিত্য পরমাণু, নিত্য আত্মা এবং তার সঙ্গে সম্বদ্ধ ধর্ম, অধর্ম, সংস্কার ছাড়াও যে সকল পদার্থ নিত্য যেমন দিক্, কাল, আকাশ, মনঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের প্রযত্ন প্রভৃতি এবং পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণও মহাপ্রলয়ে বিদ্যমান থাকে। এ ছাড়াও কালের অবচ্ছেদক উপাধিস্বরূপ মহাভূতের সংক্ষোভ জনিত যে বেগ সেই বেগজন্য কর্মসমূহও বিদ্যমান থাকে। তা না হলে কালের অবচ্চেদক ব্যতীত পুনরায় সৃষ্টি হতে পারবে না। সুতরাং বৈশেষিকমতে জন্ম হতে জন্মান্তরে দীর্ঘকাল ধরে জন্ম ও মৃত্যু জনিত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে করতে ক্লান্ত জীবকুলকে আপাত-বিশ্রাম প্রদানের নিমিত্ত পরম করুণাময় ঈশ্বর জগৎ-সংহারের ইচ্ছা করেন। ফলস্বরূপ প্রত্যেক কার্যদ্রব্যের পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। যার ফলে পরমাণুদ্বয়ের বিভাগ হয়। এই বিভাগের দ্বারা পরমাণুদ্বয়ের মধ্যেকার সংযোগ বিনষ্ট হয়। পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুক বিনষ্ট হয়ে যায়। আর দ্ব্যণুক বিনষ্ট হলে দ্ব্যণুকে আশ্রিত ত্র্যণুক বিনষ্ট হয়ে যায়। ত্র্যণুক বিনষ্ট হলে ত্র্যণুকে আশ্রিত চতুরণুক বিনষ্ট হয়। চতুরণুক বিনষ্ট হলে তদাশ্রিত পঞ্চাণুক বিনষ্ট হয়। পঞ্চাণুক বিনষ্ট হলে পঞ্চাণুকে আশ্রিত যে ষড়ণুক তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এভাবে ক্রমে ক্রমে স্থূল কার্যদ্রব্যসমূহের বিনাশ ঘটে। যাকে বৈশেষিকাচার্যগণ প্রলয় নামে অভিহিত করেছেন।

শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রাদিতে চার প্রকার প্রলয়ের বর্ণনা পাওয়া যায়, যথা – নিত্য প্রলয়, নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃত প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়। যে প্রলয় আমাদের জীবনে নিত্যদিন তথা প্রতিদিনই সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে শাস্ত্রাকারগণ নিত্য প্রলয় বলেছেন। যেমন – সুষুপ্তির অবস্থা হল নিত্য প্রলয়ের উদাহরণ। কারণ প্রায় প্রতিদিনই নিদ্রাকালে এটি সংঘটিত হয়ে থাকে। সুষুপ্তিকালে জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি কার্য সেই সেই জীবের নিজ নিজ আত্মাতে লীন হয়ে যায় অর্থাৎ প্রলয়াবস্থা প্রাপ্ত

হয়। এই প্রলয় প্রতিদিনই নিদ্রাকালে সংঘটিত হয় বলে, সুসুপ্তিকে নিত্য প্রলয় বলা হয়েছে। আর কোনও কিছুর নিমিত্ত যে প্রলয় সংঘটিত হয়ে থাকে তাকে শাস্ত্রে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। কার্যব্রহ্ম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ, যিনি পুরাণাদিতে ব্রহ্মা নামে অভিহিত, তাঁর পরিমিত এক দিবসের অবসানে অর্থাৎ কল্পান্তে তিনি যখন নিদ্রিত হন তখন ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ – এই তিন লোকের প্রলয় হয়। ব্রহ্মার বিশ্রামকালের নিমিত্ত এই প্রলয় সংঘটিত হওয়ায় একে শাস্ত্রে নৈমিত্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। তারপর রাত্রিশেষে যখন ব্রহ্মা জাগ্রত হন তখন পুনরায় তিনলোকের সৃষ্টি করেন। এভাবে কল্পান্তে নৈমিত্তিক প্রলয় এবং কল্পারম্ভে সৃষ্টি এভাবে চলতে থাকে। আর ব্রহ্মার পরিমিত একশত বর্ষ অন্তে তথা ব্রহ্মার আয়ুর শেষে বিদেহমুক্তিকালে স্থূল, সূক্ষ্ম সকল প্রকার জগতের তার প্রকৃতিতে যে লয়, তা হল প্রাকৃত প্রলয়। একে শাস্ত্রে মহাপ্রলয়[35] বলা হয়েছে। আর ব্রহ্মজ্ঞান হলে পর অজ্ঞান নাশপূর্বক সমস্ত প্রকার কার্যদ্রব্যের যে আত্যন্তিক বিনাশ, তাকে শাস্ত্রে আত্যন্তিক প্রলয় বলা হয়েছে। অনেক আচার্য প্রলয়কে আবার খণ্ডপ্রলয় ও মহাপ্রলয় ভেদে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। যে প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের অংশত বিনাশপ্রাপ্ত তাকে খণ্ডপ্রলয় বলা হয়েছে। আর যে প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সকল ভাবকার্য যুগপৎ লয়প্রাপ্ত হয় তা হল মহাপ্রলয়।

প্রশস্তপাদভাষ্যে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়াটিকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে - ততঃ পুনঃ প্রাণিনাং ভোগভূতয়ে মহেশ্বরসিসৃক্ষানন্তরং সর্বাত্মগতবৃত্তিলব্ধাদৃষ্টাপেক্ষেভ্যস্তৎসংযোগেভ্যঃ পবনপরমাণুষু কর্মোৎপত্তৌ তেষাং পরস্পরসংযোগেভ্যো দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণ মহান্ বায়ুঃ সমুৎপন্নো নভসি দোধূয়মানস্তিষ্ঠতি। তদনন্তরং তস্মিন্নেব...দ্ব্যণুকাদিপ্রক্রমেণোৎপন্নো মহাংস্তেজোরাশিঃ কেনচিদনভিভূতত্বাদ্দেদীপ্যমানস্তিষ্ঠতি'[36]। সৃষ্টির প্রাক্কালে ঈশ্বরের জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা জাগরিত হলে জীবের অদৃষ্টবশতঃ সর্বপ্রথম পরমাণু-সমূহ স্পন্দিত হয়। কারণ প্রথমে পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। পরমাণুসমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হলে দু'টি দু'টি করে সজাতীয় পরমাণু তথা দু'টি বায়বীয় পরমাণু, দু'টি জলীয় পরমাণু, দু'টি পার্থিব পরমাণু, দু'টি তৈজস্

[৩৫] ঐ, পৃষ্ঠা – ১২-১৫।

[৩৬] দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০, পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮।

পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অসংখ্য বায়বীয়, জলীয়, পার্থিব ও তৈজস্ দ্ব্যণুক উৎপন্ন করে। এই দ্ব্যণুক-সমূহই হল প্রথন উৎপন্ন কার্যদ্রব্য। আমরা জানি বৈশেষিকমতে যে কোনও কার্যদ্রব্যের উৎপত্তিতে তার সমবায়ি, অসমবায়ি ও নিমিত্ত কারণ অপেক্ষিত হয়। দ্ব্যণুকরূপ কার্যদ্রব্য উৎপত্তিতে সমবায়িকারণ হবে পরমাণু দু'টি, কারণ যে অধিকরণে সমবায়-সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয় তাকে সমবায়িকারণ বলে। পরমাণুরূপ অধিকরণে দ্ব্যণুক সমবায়-সম্বন্ধে উৎপন্ন হয়। তাই দ্ব্যণুকরূপ কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে তদীয় দ্ব্যণুকের অবয়ব তথা পরমাণু দু'টি। আর ক্রিয়াজন্য দু'টি পরমাণুর যে সংযোগ তা হবে দ্ব্যণুকরূপ কার্যের প্রতি অসমবায়িকারণ। আর দ্ব্যণুকের নির্মাতা ঈশ্বর, দ্ব্যণুকের জনক পরমাণুদ্বয় বিষয়ে তাঁর জ্ঞান, তাঁর দ্ব্যণুকোৎপাদক ইচ্ছা, তাঁর দ্ব্যণুক নির্মাণে প্রযত্ন, কাল, দিক্, দ্ব্যণুক প্রাগভাব, এই দ্ব্যণুক পরম্পরাক্রমে যে সকল জীবের সুখ-দুঃখের কারণ হবে সেই জীবের অদৃষ্ট এবং প্রতিবন্ধকাভাব – এই নয়টি হবে নিমিত্ত কারণ। এভাবে ত্রিবিধ কারণ হতে দ্ব্যণুকসমূহ উৎপন্ন হলে পর জীবের অদৃষ্ট এবং ঈশ্বরের প্রযত্নে ঐ দ্ব্যণুক সমূহে পুনরায় ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। এই ক্রিয়া হতে সজাতীয় তিনটি দ্ব্যণুক তথা তিন বায়বীয় দ্ব্যণুক, তিনটি জলীয় দ্ব্যণুক, তিনটি পার্থিব দ্ব্যণুক এবং তিনটি তৈজস্ দ্ব্যণুক পরস্পর সংযুক্ত হয়ে ত্র্যণুক নামক কার্যদ্রব্য উৎপন্ন করে। এই ত্র্যণুকরূপ কার্যদ্রব্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে দ্ব্যণুকত্রয়, অসমবায়িকারণ হবে দ্ব্যণুকত্রয়ের পরস্পর সংযোগ এবং ঈশ্বর প্রভৃতি নয়টি কারণ হবে নিমিত্ত কারণ। ত্রসরেণু-সমূহের উৎপত্তির পর পূর্বোক্ত ক্রমে পুনরায় ত্রসরেণু সমূহে ক্রিয়া উৎপন্ন হয়। ফলস্বরূপ সজাতীয় চারটি ত্রসরেণু তথা চারটি বায়বীয়, চারটি জলীয়, চারটি পার্থিব এবং চারটি তৈজস্ ত্রসরেণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে অসংখ্য চতুরণুক উৎপন্ন করে। এই চতুরণুরূপ কার্যের প্রতি সমবায়িকারণ হবে প্রতিটি চতুরণুকরূপ কার্যের অবয়বস্বরূপ চারটি ত্র্যণুক। আর চারটি ত্র্যণুকের পরস্পর সংযোগ হবে অসমবায়িকারণ এবং পূর্বোক্ত নয়টি অর্থাৎ ঈশ্বর প্রভৃতি হবে নিমিত্ত কারণ। এভাবে পূর্বোক্ত রীতিতে পাঁচটি চতুরণুক মিলিত হয়ে পঞ্চাণুক, ছয়টি পঞ্চাণুক মিলিত হয়ে ষড়ণুক এভাবে ক্রমশ স্থূল থেকে স্থূলতর, স্থূলতর হতে স্থূলতম কার্যদ্রব্যের উৎপত্তি চলতে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে ন্যায়-বৈশেষিক সম্প্রদায় আরম্ভবাদী; তাই তাঁরা মনে করেন কার্য ও কারণ দু'টি ভিন্ন বস্তু। দ্ব্যণুকাদি উৎপত্তির পূর্বে তা তার সমবায়িকারণ পরমাণুসমূহে নিহিত থাকে না। বরং পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে সম্পূর্ণ নতুন একটি কার্যদ্রব্য দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়। কাজেই বৈশেষিকমতে প্রতিটি কার্যদ্রব্য তার স্ব স্ব সমবায়িকারণ হতে ভিন্ন। এই হেতু সৃষ্টি বিষয়ে বৈশেষিক অভিমত আরম্ভবাদ নামে অভিহিত। বৈশেষিকাচার্যগণ বলেন 'কারণগুণা হি কার্যগুণারম্ভতে' অর্থাৎ কারণগতগুণই কার্যগুণকে উৎপন্ন করে। যেমন – তন্তুরূপ পটরূপকে উৎপন্ন করে। কাজেই বৈশেষিকমতে কার্যমাত্রই নতুন সৃষ্টি।

চতুর্থ অধ্যায়

আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে জগৎঃ সৃষ্টি ও প্রলয়

সুপ্রাচীন কাল হতে আজ পর্যন্ত মানুষ জগৎ-সৃষ্টির রহস্য উন্মচনের নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়েই চলেছে। এই জগতের সৃষ্টি হল কীভাবে? এটি এসেছে কোথা থেকে? যাচ্ছেই বা কোথায়? মহাবিশ্বের কি কোনও শুরু ছিল? যদি কোনো শুরু থেকে থাকে তা হলে তার আগে কি ছিল? কার দ্বারা এই জগৎ সৃষ্ট? এই জগতের স্থায়িত্ব কতদিন? যাকিছু সৃষ্ট তা যেহেতু মহাকালের গহ্বরে একদিন বিলীন হয়ে যায় সেহেতু এই বৈচিত্র্যময় যে জগৎ তা কি এক সময় কালের গহ্বরে হারিয়ে যাবে? এই জগতের ধ্বংস কীভাবে হতে পারে? এমন অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর মানুষ নিরন্তর খুঁজে চলেছে। সে দার্শনিক হোন কিংবা বৈজ্ঞানিক কিংবা সাধারণ মানুষ প্রত্যেকে নিজ নিজ আঙ্গিকে জগতের সৃষ্টি রহস্যের সমাধান খুঁজছেন। যদিও সকলের মূল লক্ষ্য এক; তা হল জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের সৃষ্টিরহস্যের সমাধান অনুধাবন। তথাপি তাঁদের পথ ভিন্ন ভিন্ন। যাঁরা ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষ, তাঁরা তাঁদের ধর্ম ও ধর্মীয় গ্রন্থ সমূহের আলোকে জগতের সৃষ্টি ও সংহার বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যিনি দার্শনিক তিনি যুক্তি ও সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে জগতের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করেছেন। আবার যিনি বৈজ্ঞানিক তিনি পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে জগৎ এর সৃষ্টি কীভাবে হয়েছে তার ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। মূল কথা হল বৈজ্ঞানিক কিংবা দার্শনিক তাঁদের মূল লক্ষ্য মূলত এক - জগৎ-সম্পর্কীয় নানা রহস্যের অনুসন্ধান; যদিও তাঁদের পথ ভিন্ন ভিন্ন।

জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের ব্যাখ্যা হিসাবে আধুনিক বিজ্ঞানে যে দু'টি মত অধিক প্রচলিত, তাদের একটি হল সদা সমাবস্থা তত্ত্ব বা স্থিতাবস্থাশীল তত্ত্ব (Steady State Theory) এবং আর একটি হল বিবর্তন তত্ত্ব (Theory of the Evolving Universe). অ্যারিস্টটল (Aristotle) –এঁর সময়কাল (আনুমানিক ৩৮৪ - ৩২২ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ) হতে পরবর্তী একশত বৎসরের অধিক কাল পর্যন্ত মানুষের বিশ্বাস ছিল – মানবজাতি এবং তার চারপাশের

এই বিশ্ব-জগৎ চিরকাল ছিল, আছে এবং থাকবে। মূল কথা হল আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি তা চিরকালই অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান। মানুষ জন্মানোর পর থেকে যেভাবে জগৎকে দেখে আসছে, জগৎ আসলে তেমনই। মানুষ শৈশবে জগৎকে যেমন দেখেছে, কৈশোর ও যৌবনের গণ্ডি পেরিয়ে যখন সে বার্ধক্যে উপনীত হবে, তখনও জগৎকে তেমনই দেখবে। এর সপক্ষে তাঁদের যুক্তি ছিল – আমাদের পিতামহ-প্রপিতামহ কিংবা তাঁদের পিতামহ-প্রপিতামহ সবাই যেভাবে জগৎকে দেখে আসছে জগৎ প্রকৃতপক্ষে তেমনই রয়েছে। কাজেই বলা যায়, এই মহাবিশ্বকে আমরা যেভাবে দেখে আসছি, তা তেমনই চিরন্তন ও অপরিবর্তনশীল।

স্যর্ আইজ্যাক্ নিউটন ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মহাকর্ষতত্ত্বটি আবিষ্কারের পর জগৎ সম্পর্কে উক্ত ধারণাটি ভেঙে পড়তে থাকে। কারণ মহাকর্ষতত্ত্ব অনুসারে, এই জগত-এর সমস্ত বস্তুই একে অন্যকে একটি বল দ্বারা আকর্ষণ করে। যাকে মহাকর্ষ বল বলা হয়েছে। যাই হোক মহাকর্ষতত্ত্ব স্বীকৃত হলে, আর জগতের স্থিতাবস্থা স্বীকার করা যাবে না। এই জগৎ যে স্থির নয়, তা ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে – এই তথ্যটি ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেন মার্কিন জ্যোতির্বিদ এডুইন পি. হাব্‌ল (Edwin P. Hubble).

'মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হচ্ছে'[৩৭] হাব্‌ল এর এই সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করা যায় একটা সময় ছিল যখন সমস্ত বস্তুপিণ্ড পরস্পরের নিকটে অবস্থান করতো। তারপর কোনওও এক সময়ে সবকিছু গতিপ্রাপ্ত হয়েছিল। মনে করা হয় আনুমানিক দশ কিংবা কুড়ি হাজার মিলিয়ান বছর পূর্বে মহাবিশ্বের সমস্ত কিছু একই জায়গায় ছিল। সেই সময় মহাবিশ্বের ঘনত্ব ছিল অসীম। মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তু এবং শক্তি সঙ্কুচিত হয়ে একটি অতিক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'মহাডিম্ব' (Cosmic Egg). ঐ অতিক্ষুদ্র পিণ্ডটির ভিতরের তাপমাত্রা ছিল বহু লক্ষ ফারেনহাইট। প্রচণ্ড চাপ ও ঘনত্বের কারণে একদিন এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। এখানে উল্লেখ্য যে, মহাবিস্ফোরণ বলতে

[৩৭] Bartusiak, Marcia, The Day We Found the Universe, New York, Pantheon Books, 2009, pages – 250-270.

বিজ্ঞানিগণ প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন প্রসারণকে বুঝিয়েছেন। এই বিস্ফোরণের পর অতি ঘন পিণ্ডটি টুকরো টুকরো অংশে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতি সেকেন্ডে কয়েক হাজার কিলোমিটার বেগে ছুটতে থাকে। এই গতিশীল বস্তু থেকেই নীহারিকাপুঞ্জ কিংবা ছায়াপথ সমূহের উৎপত্তি হয়েছে। সুতরাং বিজ্ঞানীদের মতে এই আদি বিস্ফোরণ (Big Bang)[৩৮] থেকেই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। তারপর থেকে মহাবিশ্ব ক্রমশঃ প্রসারিত হয়েই চলেছে। এই প্রসারণ কোটি কোটি বছর ধরে চলতে থাকবে। তারপর একটা সময় আসবে যখন মহাকর্ষের প্রভাবে এই প্রসারণ বন্ধ হয়ে যাবে এবং প্রচণ্ড চাপের কারণে যাবতীয় বস্তু সঙ্কুচিত হতে থাকবে। বছরের পর বছর ধরে এভাবে সঙ্কুচিত হতে হতে একটা সময় সবকিছু পুনরায় অতি ঘনত্ববিশিষ্ট পিণ্ডে পরিণত হবে। তারপর আবার ঘটবে মহাবিস্ফোরণ[৩৯]। এভাবে সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বয়ে চলবে।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে এটা পরিষ্কার যে আধুনিক বিজ্ঞান জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়কে ব্যাখ্যা করার জন্য সঙ্কোচন ও প্রসারণের নীতিকে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন সৃষ্টির আদিতে এই জগৎ অতিমাত্রায় সঙ্কুচিত অবস্থায় ছিল। প্রচণ্ড চাপ ও ঘনত্বের কারণে এক সময় তীব্র বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের পর সেগুলি প্রচণ্ড গতিতে ক্রমশঃ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রসারিত হতে হতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত কিছু তথা নানা নক্ষত্রপুঞ্জ, আমাদের এই পৃথিবী, মেঘরাশি, জল, আলো, বাতাস, প্রাণী সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে। আবার যখন এই মহাবিশ্বের চাপ ও তাপ ক্রমশঃ কমে আসবে তখন শুরু হবে সঙ্কোচনের পালা। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সঙ্কুচিত হতে হতে অতিক্ষুদ্র কিছু মৌল উপাদানে পরিণত হবে। তারপর আবার ঘটবে মহাবিস্ফোরণ; তারফলে নতুন সৃষ্টি আসবে। সেই সৃষ্টির পর পুনরায় সঙ্কোচন তথা প্রলয় -এভাবে সৃষ্টি ও প্রলয়ের তথা প্রসারণ ও

---

[৩৮] বিজ্ঞানের জগৎ-এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বিষয়ে এটি একটি সর্বজন গৃহীত তত্ত্ব। ১৯২৯ সালে বেলজিয়ামের ধর্মপ্রচারক জর্জ এদুয়ার ল্যমেত্র সর্বপ্রথম এই তত্ত্বের সাহায্যে জগৎ-এর সৃষ্টি বর্ণনা করেছিলেন। এই তত্ত্বের অনুসারে আনুমানিক ১ হাজার ৩৮০ বছর পূর্বে একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র, প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও অতীব ঘন এক বিন্দু থেকে মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এই বিশ্বজগৎ-এর সৃষ্টি হয়েছে।

[৩৯] Hawking, Stephen, *A Brief History of Time*, London, Bantam Books, 1988, pages – 39-58.

সঙ্কোচনের মধ্যে দিয়ে এই বিশ্বজগৎ আবর্তিত হয়ে চলবে যুগ হতে যুগান্তর। এই আবর্তনের কোনো শেষ নেই। এখন আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের সৃষ্টি ও প্রলয় প্রক্রিয়া অনুধাবন করি তা হলে বুঝতে পারবো আজ থেকে সহস্রাধিক বছর পূর্বে ভারতীয় আচার্যগণ একথাই বলে গিয়েছেন। বৈশেষিক-দর্শনে বলা হয়েছে, এই জগৎ-সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে দিয়েই বয়ে চলেছে। আমরা যে জগৎ-এ বসবাস করছি সেই জগতের সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় ছিল এবং সেই প্রলয়ের পূর্বে এক সৃষ্টি ছিল এবং সেই সৃষ্টির পূর্বে ছিল অন্য প্রলয় - এভাবে অনন্ত প্রবাহ বয়ে চলেছে। শুধু তাই নয় আমরা যদি বৈশেষিক-সম্মত জগৎ-সৃষ্টি প্রক্রিয়ার প্রতি আলোকপাত করি তা হলে বুঝতে পারবো তাঁদের সৃষ্টি-রহস্য বর্ণনার মূলেও রয়েছে সঙ্কোচন-প্রসারণের ধারণাটি।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার

আজকের আধুনিক বিজ্ঞান যখন স্বতন্ত্র একটি শাখারূপে আত্মপ্রকাশই করেনি, সেই সহস্রাধিক বছর পূর্বে বেদ-উপনিষদ-পুরাণাদির কালে কিন্তু আমাদের ভারতীয় মহর্ষিগণ যে বিষয়গুলির প্রতি আলোকপাত করে গেছেন, আজকের আধুনিক বিজ্ঞান তার অনুরণন করে চলেছে মাত্র। বৈচিত্র্যেভরা এই বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে তা সেই বেদ-পুরাণাদির কাল হতে ভারতীয় আর্য ঋষিগণের লেখনীর ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। যদিও জগৎ-বিষয়ক নানান তথ্যসমূহকে তাঁরা বিভিন্ন গল্প-গাথা কিংবা কল্প-কাহিনীর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করতেন। কারণ তৎকালীন সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন মানুষ নীরস তথ্য-কথা শুনতে ততোটা পছন্দ করে না যতটা পছন্দ করে নানা কল্প-কাহিনী শুনতে। তাই সেই সময় জগৎ-বিষয়ক নীরস তথ্যগুলিকে অধিক হৃদয়স্পর্শী করে তোলার জন্য নানা কল্প-কাহিনীর আশ্রয় নেন।

আমরা যদি বৈশেষিক-দর্শনের দিকে তাকাই তা হলে দেখতে পাব আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের বহু তত্ত্ব, যেমন – পরমাণুতত্ত্ব, বস্তুর রাসায়নিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা, জগৎসৃষ্টি এবং তার বিবর্তন প্রক্রিয়া, বস্তুর গুরুত্ব, গতির ধারণা, বলবিদ্যা, অভিকর্ষ শক্তি, শব্দ-পরিবহনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বৈশেষিক আচার্যগণের যে ব্যাখ্যা তা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও মানুষকে বিস্মিত করে।

সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে যদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করা হয় তা হলে আমরা বুঝতে পারবো আজ হতে সহস্রাধিক বছর পূর্বে বৈশেষিকাচার্যগণের জগৎ ও জাগতিক বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে বিশ্লেষণী চিন্তা তা আজকের দিনে দাঁড়িয়েও আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা ও বিস্ময় না জাগিয়ে পারে না। আধুনিক বিশ্ব পরমাণুবাদে উন্নত থেকে উন্নততর পথে পা বারিয়েছে। একটু কান পাতলে শোনা যায় এক রাষ্ট্রের সঙ্গে ওপর রাষ্ট্রের শক্তির প্রতিযোগিতা ও পারমাণবিক অস্ত্র প্রয়োগের হুঙ্কার। এই পরমাণু বিজ্ঞানের উৎস

খুঁজে পাই যে দর্শনে তা হল বৈশেষিক-দর্শন। বৈশেষিক-দর্শনই পরমাণুর অমিত শক্তির সন্ধান বিশ্ববাসীকে প্রথম দিয়েছিলেন। তবে যে পরমাণু থেকে ক্রমে ক্রমে এই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, যে পরমাণুর অসাধারণ ক্ষমতা বৈশেষিক-দর্শনের ছত্রে ছত্রে নিহিত; সেই পরমাণুর প্রয়োগ যাতে মানব-কল্যাণের নিমিত্ত হয় সেটাই ছিল আর্য ঋষিগণের আশা ও আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু আজ আমরা লক্ষ্য করছি 'বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়' যে শাস্ত্রের উদ্ভব সেই শাস্ত্রের অভিলাষকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নিজেদের স্বার্থে তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা মেতে উথেছি বিশ্বের ধ্বংসলীলায়। যে আগুন আমাদের পাকের জন্য উদ্ভূত, তাকে আমরা অন্যের গৃহদাহের নিমিত্ত ব্যবহার করছি। কিন্তু এটা ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য নয়। ভারতবর্ষ শান্তির পিয়াসী একটি দেশ। সকল ধর্মের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই ভারতবাসীর আদি ধর্ম। তাই প্রাচীন ভারতীয় আচার্যগণ তাঁদের অভূতপূর্ব নানান আবিষ্কারকে আধ্যাত্মিকতার মোড়কে প্রচার করে গেছেন জগতের মঙ্গলের জন্য।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

- আরণ্য, সাংখ্যযোগাচার্য শ্রীমৎ স্বামী হরিহরানন্দ, *পাতঞ্জল যোগদর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৮।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর ন্যায়াচার্য (অনুদিত), শ্রী কেশব মিশ্র বিরচিতা *তর্কভাষাঃ*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪১৫।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর, *নাস্তিকদর্শনে প্রমাণতত্ত্ব*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।
- কর, শ্রী গঙ্গাধর, *নীল আকাশের নীচে*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২১।
- গোস্বামী, ডঃ শ্রীসীতানাথ (অনুদিত), শ্রী শ্রী সদানন্দযোগীন্দ্রসরস্বতী প্রণীত *বেদান্তসার*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৯।
- গোস্বামী, মহারাজ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী (সম্পাদিত), *তত্ত্বমুক্তাবলী* (মায়াবাদ শতদূষণী), কলকাতা, গৌড়ীয় মঠ, ১৩১৯।
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র (অনুদিত), শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩।
- গোস্বামী, শ্রী নারায়ণচন্দ্র (অনুদিত), ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত *'সাংখ্য-কারিকা'*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।
- ঘোষাল, শরচ্চন্দ্র, শ্রীমদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত *বেদান্ত-পরিভাষা*, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৪।
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০১৯।
- চক্রবর্তী, সত্যজ্যোতি (অনুবাদক), সায়ণ মাধবীয় *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহঃ*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০২০।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *ভারতে বস্তুবাদ প্রসঙ্গে*, কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ১৯৮৭।
- চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, *লোকায়ত দর্শন*, কলিকাতা, নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৬৬৩।

- চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা (অনুদিত), মোক্ষাকরগুপ্ত বিরচিত *বৌদ্ধ তর্কভাষা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২০।
- চট্টোপাধ্যায়, মধুমিতা, *নাগার্জুনের দর্শন পরিক্রমা*, কলিকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।
- চট্টোপাধ্যায়, শ্রী অক্ষয়কুমার, *বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব*, কলকাতা, বারআনা, ১৯৩১।
- জর্জ, ইফতেহার রসুল (অনুদিত), *কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ঃ বৃহৎ বিস্ফোরণ থেকে কৃষ্ণগহ্বর*, স্টিফেন ডব্লু হকিং, ঢাকা, ঐশী পাবলিকেশন, ২০১৫।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, চতুর্থ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, তৃতীয় খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৭/এ।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪/বি।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, পঞ্চম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ ১৯৮৯।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়দর্শন*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮১।
- তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, *ন্যায়-পরিচয়*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৭৮।
- তর্করত্ন, শ্রী পঞ্চানন (সম্পাদিত), *বৈশেষিক-দর্শনম্*- মহর্ষি কণাদ প্রণীতম্, কলিকাতা, শ্রী নটবর চক্রবর্তী, ১৩১৩।
- ত্রিপাঠী, শ্রী দীননাথ, *মানমেয়োদয়ঃ*, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৯।
- দত্ত শর্মা, রত্না, *ন্যায়দর্শনে নিগ্রহস্থান*, কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০।
- দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দ্বিতীয়ভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০০০।

- দামোদরাশ্রম, দণ্ডিস্বামী (অনুদিত), *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, প্রথমোভাগঃ, কলকাতা, দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম, ২০১০।
- দাসগুপ্ত, শক্রজিৎ (অনুদিত), *স্টিফেন হকিং এর কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, কলকাতা, বাউলমন প্রকাশন, ১৩৯৯।
- নাগ, কবিরাজ ব্রজেন্দ্রচন্দ্র (সম্পাদিত), *চরক-সংহিতা*, কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮৪।
- নিজামী, মাহমুদুল হাসান, *সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান*, ঢাকা, রোদেলা, ২০১৮।
- পাল, শ্রী মহেশ চন্দ্র(অনুদিত), *সাংখ্যদর্শনম্*- শ্রী বিজ্ঞানভিক্ষু বিরচিত প্রবচন ভাষ্য সহিতম্, কলকাতা, শ্রী মহেশ চন্দ্র পাল, ১৮০৭।
- পাত্র, সুধাংশু, *প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র ও ভারতীয় বিজ্ঞান*, কলকাতা, বাণীশিল্প, ১৩৬৭।
- বড়ুয়া, সুভূতিরঞ্জন, ভদন্ত অনুরুদ্ধাচার্য বিরচিত *অভিধর্মার্থ-সংগ্রহ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৫।
- বন্দোপাধ্যায়, নবনারায়ণ (সম্পাদিত), শ্রীকৃষ্ণযজ্বিরচিত *মীমাংসা-পরিভাষা*, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৩।
- বিদ্যাবিনোদ, শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ, *বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রী মাধ্ব*, ঢাকা, শ্রী সুপতিরঞ্জন নাগ, ১৯৩৯।
- বেদব্যাস, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন (অনুবাদক), *বিষ্ণুপুরাণ*, কলকাতা, শ্রী অরুণোদয় রায়, ১২৯৭।
- বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য, শ্রী পূর্ণচন্দ্র (সংকলিত), *পাতঞ্জলদর্শন*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৮৯৮।
- ব্রহ্মচারী, শ্রী শীলানন্দ, *অভিধর্ম-দর্পণ*, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৭।
- ভট্টাচার্য শাস্ত্রিনা, শ্রীপঞ্চানন (অনুবাদক), শ্রীমৎ সায়ণমাধবকৃত *সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে প্রথমংঃ চার্বাক-দর্শনম্*, আগড়পাড়া-২৪ পরগনা, শ্রী সাম্যাব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪।
- ভট্টাচার্য, জয়, শিবাদিত্য বিরচিত *সপ্তপদার্থী*, কলকাতা, রামকৃষ্ণ মিশন ইন্সিটিউট অব কালচার, ২০১০।

- ভট্টাচার্য, বিধুভূষণ, *সাংখ্যদর্শনের বিবরণ,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০০৮।
- ভট্টাচার্য, মধুসূদন ন্যায়াচার্য (অনুদিত), রঘুনাথ শিরোমণিকৃত *পদার্থতত্ত্বনিরূপণম্,* কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৭৬।
- ভট্টাচার্য, শ্রী বিশ্ববন্ধু, *অনুমানচিন্তামণি,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, ১৯৯৩।
- ভট্টাচার্য, শ্রীরামশঙ্কর (সম্পাদিত), পাতঞ্জল-যোগদর্শনম্; তত্ত্ববৈশারদীসংবলিত ব্যাসভাষ্যসমেতম্, বারাণসী, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৬৩।
- ভট্টাচার্য-তর্ক-সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমদ্ ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বিরচিত *বেদান্ত পরিভাষা,* কাঁথি, শ্রীনাথ ভবন, ১৩৭৭।
- ভট্টাচার্য-শাস্ত্রী, শ্রীমৎ পঞ্চানন (অনুদিত), *ভাষাপরিচ্ছেদঃ,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৪২৩।
- ভট্টাচার্য্য, শ্রী অনন্তকুমার ন্যায়তর্কতীর্থ, *বৈভাষিকদর্শন,* ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, ১৯৫৫।
- ভট্টাচার্য্য, শ্রী, শ্রীমোহন, শ্রীমদাচার্যোদয়ন-প্রণীতঃ *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ,* কলকাতা, পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৯৫।
- ভট্টাচার্য্য, সুখময়, *পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬।
- ভিক্ষু, শ্রী বিজ্ঞান, মহর্ষিকপিল-প্রণীত *সাংখ্যদর্শনম্,* কলিকাতা, শ্রী মহেশচন্দ্র পাল, ১৮০৭।
- মহাপ্রজ্ঞ, আচার্য, *জীব-অজীব,* লক্ষ্ণৌ, জৈন বিশ্ব ভারতী, ২০০৩।
- মহাস্থবির, শ্রীধর্ম্মাধার (অনুদিত), মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন প্রণীত *বৌদ্ধদর্শন,* কলিকাতা, বৌদ্ধ ধর্ম্মাঙ্কুর বিহার, ১৩৬৩।
- মিশ্র, অধ্যাপক শ্যামাপদ, শ্রীমদ্ উদয়নাচার্য প্রনীতঃ *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* (প্রথমদ্বীতিয়স্তবকমাত্রম্), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৯০।

- মিশ্র, মহামহোপাধ্যায় শালিক নাথ, *প্রকরণ-পঞ্চিকা,* কাশী, হরিদাস গুপ্ত, ১২০৪।
- মুৎসুদ্দি, শ্রী বিরেন্দ্রলাল, *অভিধর্ম্মার্থ-সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্ত-সার অভিধর্ম্ম,* কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৪।
- মুনি, নথমল, *জৈনদর্শন কি মৌলিক তত্ত্ব,* কলকাতা, মতিলাল বেংগানী চ্যারিটেবল ট্রাস্ট, ২০০০।
- শর্ম্মা, শ্রী সতীশচন্দ্র, *চরক-সংহিতা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩১১।
- শাস্ত্রী, দক্ষিনারঞ্জন, *চার্বাকদর্শন,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৩।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* তৃতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* দ্বিতীয়খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ (অনুদিত), উদয়নাচার্যকৃত *কিরণাবলী,* প্রথমখণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- শাস্ত্রী, শ্রী গৌরীনাথ এবং ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *ব্রহ্ম-পুরাণ,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৩৫৯।
- শাস্ত্রী, শ্রী পঞ্চানন (অনুদিত), শ্রীমৎ-সায়ণমাধবকৃত *সর্বদর্শন-সংগ্রহে প্রথমং চার্বাক দর্শনম্,* আগড়পাড়া, ২৪ পরগণা, শ্রীসাম্যব্রত চক্রবর্তী, ১৩৯৪।
- শ্যামসুখা, শ্রী পূরণচাঁদ, *জৈনদর্শনের রূপরেখা,* কলকাতা, আর এন চ্যাটার্জী অ্যান্ড কোং, ১৩৫৫।
- সপ্ততীর্থ, শ্রীভূতনাথ (অনুবাদক), *মনুস্মৃতির মেধাতিথিভাষ্য,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৩৬১।

- সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ (সম্পাদিত ও অনুদিত), *মীমাংসা-দর্শনম্,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ১৪১৬।
- সপ্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ (সম্পাদিত ও অনুদিত), *মীমাংসা-দর্শনম্,* দ্বিতীয় খণ্ড, কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭।
- সরকার, তমোঘ্ন, *জৈন জ্ঞানতত্ত্ব ও তর্কপরিভাষা,* কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২১।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্তদর্শনের ইতিহাস,* তৃতীয় ভাগ, বরিশাল, শ্রী শঙ্কর মঠ, ১৩৩৪।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস,* দ্বিতীয় ভাগ, কলিকাতা, স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ট্রাস্ট, ১৩৩৪।
- সরস্বতী, শ্রীমৎ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, *বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস,* প্রথম ভাগ, বরিশাল, শ্রী শঙ্কর মঠ, ১৩৩২।
- সরস্বতী, স্বামী প্রত্যগাথানন্দ, *পুরাণ ও বিজ্ঞান,* কলিকাতা, সংস্কৃত কলেজ , ১৯৬২।
- সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ (অনুদিত ও সম্পাদিত), *শ্রীভাষ্যম্,* বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩১৯।
- সাধুখাঁ, সঞ্জিত কুমার, শ্রী জয়ন্তভট্টকৃত *ন্যায়মঞ্জরী,* কলকাতা, সদেশ, ২০০৬।
- সাধুখাঁ, সঞ্জিতকুমার (সম্পাদিত), আচার্য ধর্মকীর্তি বিরচিত *ন্যায়বিন্দু,* কলকাতা, সদেশ, ২০০৭।
- সেন, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ, *বিজ্ঞানের ইতিহাস,* দ্বিতীয়খণ্ড, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ১৯৫৮।
- সেন, শ্রীসমরেন্দ্রনাথ, *বিজ্ঞানের ইতিহাস,* প্রথমখণ্ড, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, ১৯৬২।

- স্বামী, ভর্গানন্দ (অনুদিত), পাতঞ্জল *যোগদর্শন সূত্র*, সূত্রানুবাদ, ব্যাসভাষ্য, ভাষ্যানুবাদ ও মন্তব্য, কলকাতা, স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।
- Bartusiak, Marcia, '*The Day We Found the Universe*', New York, Pantheon Books, 2009.
- Hawking, Stephen, *A Brief History of Time*, London, Bantam Books, 1988.
- Kak, Subhash, , Stillwater, U.S.A., Oklahoma State University, 2016.